আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি

সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

প্রাক্তন সহ-অধ্যক্ষ পরেশচন্দ্র সেন

তোমাদের ভুলিনি

কোষাধক্ষ্য সুকুমার দাস

শিক্ষাকর্মী দূর্গাপ্রসাদ সিং

তোমরা ঘুমাও আমরা তো আছি লাখ অযুত

সারা পৃথিবীতে যারা সাম্য, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছেন

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

২০০২

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY
ESTD-1916

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬
ফোন নং ঃ ৪৫৫ ৪৫০৪

উপদেষ্টা — অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী — শ্রী অমলকান্ত চক্রবর্তী, শ্রী মোহিনী মোহন আদক,
শ্রী রমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী অংশুতোষ খান,
শ্রী অশোক কুমার রায়,, শ্রীমতী রাইকমল দাসগুপ্ত,
শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শ্রাবণী রায়

পত্রিকা সম্পাদিকা — শতাব্দী সামতানি

বিশেষ সহযোগী সম্পাদিকা (বাংলা বিভাগ) — অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার

সম্পাদকমণ্ডলী — শুচিস্মিতা রায়, সমীক বিন্দু, শান্তনু, সুমন্ত

কর্মাধ্যক্ষ — শ্রী সজল বসাক

বিশেষ কৃতজ্ঞতা — শ্রী ঋতব্রত ব্যানার্জী, শ্রী কৌস্তভ চ্যাটার্জী,
শ্রী সজল বসাক, শ্রী রাহুল কানুনগো,
শ্রী শুভাশিস কুমার দে, শ্রী রানা সাহা,
শ্রী দেবমাল্য দাসগুপ্ত, শ্রী শুভম পুতুতুণ্ড শ্রী সুদীপ্ত,
শ্রী শান্তনু দত্তগুপ্ত, শ্রী সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়,
শ্রী অর্ক রাজপণ্ডিত, শ্রী সমীক বিন্দু, শ্রী সৌভিক,
শ্রীমতি শ্যামলী, শ্রীমতি সোমদত্তা

প্রচ্ছদ — শ্রী শেখর কুমার দত্ত

প্রকাশক — অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রক — সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২
ফোন ঃ ২৩৬-৬৪৯৯/৮৬০০/০২৮৫

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

বর্ষ ঃ ২০০১-২০০২

সভাপতি ঃ
শ্রী অশোক কুমার রায়

সহ-সভাপতি ঃ
রানা সাহা

সাধারণ সম্পাদক ঃ
সায়ন্তন সাহা

সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ
দেবমাল্য দাসগুপ্ত
অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার

যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ
শুচিস্মিতা রায়
সমীক বিন্দু

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ
গৌতম সেন
ঈপ্সিতা রায় মজুমদার

যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক ঃ
সুশীল কুমার সিং
সায়ন্তন সরকার

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ঃ
সুদীপ্ত দাস
ভিক্টর গুহ

গ্রন্থাগার সম্পাদক ঃ
শান্তনু দত্তগুপ্ত

পত্রিকা সম্পাদিকা ঃ
শতাব্দী সামতানি

কমনরুম সম্পাদক ঃ
শুভ্র সায়ক মুখার্জী

ক্যান্টিন সম্পাদক ঃ
দেবাংশু সেন

ছাত্রাবাস সম্পাদক ঃ
সনক রায় চৌধুরী

অন্যান্য সদস্য ঃ
শুভাশিস কুমার দে
দেবাশিষ চক্রবর্তী
অর্ণব দাসগুপ্ত
নীলাদ্রি প্রসাদ দাসগুপ্ত
চন্দ্রকান্তি দত্ত

Editorial

'The pen is mightier than the sword' so runs the truism. I had learnt it way back in school. Today, being the editor of this magazine, my mind falls back on that same moral. I have come accross hundreds of articles, starting from an individual's first love to the best of an individual's consciousness to save mankind from one of its dreaded killers AIDS, I have had students writing in favour of Hitler's policies, to students saying that Kashmir is hungry for peace. There have been instances where, I have had to choose between two articles on the same topic, for those whose articles have not found place in this magazine, may lose all hopes; may be the next annual magazine might as well carry your article. But, I have tried my level best to bring variety into this magazine by inviting—articles in Urdu, designs for the cover page, requesting more professors to pen-down their thoughts on various issues and making room for some historical records of college happenings.

In a year that has been so eventful and critical on all levels—domestic and international, a year that has seen violence in its extreme form, where 'terror' has been the only answer, it makes me feel happy and proud to find a good section of people still believing in the moral I learnt... where rational thinkers have taxed their intellect in bringing together thoughts on different issues.

I do not know how successful I have been in bringing together the strands of thought articulated by students and professors under one banner—criticism lies in the hands of the readers. But, I would end by thanking all students, union members, senior members and respectful teachers for their kind co-operation and constant support in the past one year.

Satabdi Samtani
Magazine Sec.

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

পৃথিবীর কোনো শক্তিই পারে না জীবনের জয়গানকে থামিয়ে দিতে। মানুষের সজীবতার কথা, প্রাণের সবুজতা আর অনন্ত রক্তিমতার কথা ঢেকে দিতে পারে না কেউ। তাই অনেক প্রতিবন্ধকতা, সীমিত সামর্থকে কাটিয়ে উঠে আমরা সক্ষম হয়েছি এই সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে। আমাদের সীমিত সামর্থের মধ্যেই আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি সৃষ্টির কথা, অনুভবের কথা, অব্যক্ত যন্ত্রণা আর লাল সূর্যের দিকে ধেয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা — আমরা বলতে চেয়েছি তোমার কথা, আমার কথা —

আমাদের কথা

বিগত একটা বছর ধরে আশুতোষ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী দিনেও ঠিক সেইভাবে ছাত্রসমাজ আমাদের পাশে থাকবে। নবীনবরণ উৎসবের অনুভবে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উৎসাহে, সরস্বতী পুজোর স্নিগ্ধতায়, কমনরুম ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্দীপনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় অন্য কলেজের জালে বল জড়িয়ে যাওয়ার উদ্দামতায়, দাবি আদায়ের দৃপ্ত মিছিলে যেরকমভাবে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে এক কথায় আমরা অভিভূত। এই প্রসঙ্গে সংসদের সকল সদস্য, সদস্যা সহ কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর প্রত্যক্ষ আন্তরিক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমরা আশাবাদী যে নতুন শতকে আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলব এক নতুন ছাত্রসমাজ, যে ছাত্রসমাজ নতুন সূর্যের কথা শোনাবে, শোনাবে নতুন দিনের গান।

অভিনন্দনসহ,
সায়ন্তন সাহা
সাধারণ সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

"পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।"

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

আলোকের ঝরণাধারায় আশুতোষ কলেজ

সুচেতনা এই পথে আলো জ্বেলে, এ পথেই একদিন পৃথিবীর ক্রম মুক্তি হবে ...

জীবনানন্দ দাশ

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আশুতোষ কলেজ আজ এক যুগ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। অষ্টাশী বছরের ঐতিহ্যময় এই কলেজ। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এই কলেজের কাছে প্রত্যাশা অনেক।

আমাদের শক্তি থাক সম্মিলিত
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে
আপাতত চোখ যাক পৃথিবীর প্রতি
শেষকার পথ নেওয়া যাবে জেনে ...

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমরা আশুতোষ কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্ররা সম্মিলিত ভাবে বিগত এক বছরে কলেজকে আরো সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছি।

ভারতবর্ষে তন্দ্রা ক্রমশঃ যায়
অহল্যা আজ শাপমোচনের দিন
তুষার জনতা বুঝি জাগ্রত হয়
গা ঝারা দেবার প্রস্তুত দ্বিধাহীন ...

সুকান্ত ভট্টাচার্য

বর্তমানে কলেজে একুশটি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। এর মধ্যে তিনটি বিষয় অনার্স বিগত বছরে খোলা হয়েছে, এগুলো হল সাইকোলজি, কম্পুটার সায়েন্স, বি.বি.এ (ব্যাচেলার অফ বিসনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। উন্নত মানের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা এখানে পড়ান। বিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত ল্যাবরেটরিকে মেরামত, সংস্কার এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সময়পোযোগী করা গেছে। অঙ্ক বিভাগের কোন নিজস্ব ল্যাবরেটরী ছিল না, ছিল না সাইকেলজি ল্যাবরেটরি ও কম্পুটার সায়েন্সের ল্যাবরেটরি (হার্ডওয়ার) এগুলো তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দ্বারা এরা সমৃদ্ধ।

অর্থনৈতিক সংকট থাকার জন্য বিগত দিনে কলেজ ভবন লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরির মেরামতি ও আমূল সম্ভবপর হয়নি সামান্য অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে বিগত এক বছরে এই সমস্ত কাজ প্রায় সমাপ্তের মুখে। একই ভবনে সকাল, দুপুর ও সান্ধ্য কলেজ চলার জন্য হয়ত কিছু অসুবিধা আছে তবুও তিন কলেজের সম্মিলিত চেষ্টায় কলেজের সীমিত কাঠামোর মধ্যে চারতলা একটি ভবন তৈরী হয়েছে যার মধ্যে রাসয়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শ্রেণীকক্ষ, ইনস্ট্রুমেন্ট রুম, ব্যালন্সরুম অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বসবার জায়গা এবং খুব বড় আকারের দুটি শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে।

কলেজের অফিস নতুনভাবে আধুনিকিকরণ ও সুপরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণ যে সীমিত পরিসরের মধ্যেও সম্ভব তা দৃষ্টান্তের দাবী রাখে।

সমস্ত কলেজভবন ও যন্ত্রপাতি যা কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি তা বীমার মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

বই পড়ার জন্য, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লাইব্রেরী বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে তার সবটাই ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী নতুন বই কেনার জন্য ব্যয়িত হয়েছে।

শিক্ষায় নারী পুরুষের অধিকার সমান। এ বছর রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যায় সহ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য বিষয়গুলোতে আগে থেকেই সহ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষা সবার জন্য। এই চিন্তাধারা থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদের সকলেরই বেতনে আংশিক বা পূর্ণ ছাড়া দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অমূল্য জীবন সুরক্ষার জন্য মাসিক ৫০ পয়সার বিনিময়ে মেডিক্লেম বীমা চালু করা হয়েছে।

কলেজের প্রসপেকটাসে প্রতিযোগিতার দিনে নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়।

পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে ...

তথ্য প্রযুক্তির চরম বিকাশ ঘটায় এবং বিশ্বায়নের ফলে সারা বিশ্বজুড়ে যে বিজ্ঞান বিপ্লব আমরা দেখছি স্বভাবতই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার অর্থ হল নিজেদের পিছিয়ে রাখা। অর্থনৈতিক সমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলেজকে ইন্টারনেট সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, বসানো হয়েছে পি.বি.বক্স ইন্টারকম, ফ্যাক্স মেসিন। আজ ওয়েবসাইটে কলেজের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞান বিভাগে একটি বা দুটি কম্পুটার দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত

উল্লেখযোগ্য যে অফিস এবং লাইব্রেরী ও কম্পিউটার করা গেছে।

যারে তুমি নীচে ফেল
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে,
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ...

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে তপশিলী জাতির জন্য বাইশ শতাংশ তপশিলী উপজাতির জন্য ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা আছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন রাখা আছে। FAEA-এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য পনের লক্ষ টাকা (পাঁচ বছরের জন্য) অনুদানের অনুমোদন পাওয়া গেছে যার আড়াই লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তি হিসেবে পাওয়া গেছে।

অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট ...

ছাত্রছাত্রীদের ক্যান্টিন নানা জটিলতায় বন্ধ ছিল। ক্যান্টিন খোলা হয়েছে। তাকে মেরামত করে নতুনভাবে সংস্কার করে সাজিয়ে দেওয়া গেছে। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ঠাণ্ডা পরিশুদ্ধ পানীয় জলের। দুটি ওয়াটার কুলারের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা গেছে। কমনরুম, ছাত্র সংসদের ঘর, ময়দানে টেন্ট, ব্যায়ামাগার, সবই নবরূপে ছাত্ররা ব্যবহার করছে। খেলাধূলার সমস্ত সরঞ্জাম কিনে দেওয়া হয়েছে।

কলেজের সম্পত্তি যাতে নষ্ট না হয় এবং অবাঞ্ছিত বহিরাগতরা যাতে কলেজে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রেণী কক্ষের বেঞ্চ, চেয়ার, পাখা, আলো যার অভাব ছিল বা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ঠিক করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একতলা থেকে চারতলা সমস্ত বাথরুম মেরামত ও ব্যবহারের উপযোগী করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অধ্যক্ষের ঘর, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের বসার ঘর, নোটিস বোর্ডের বিবর্ণ চিত্র আজ বিলীয়মান। কলেজে ঢোকার মূল পথ সম্পূর্ণ সারানো ও মার্বেল ও চেকার বসানোর কাজ সম্পূর্ণ।

আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি ...

কলেজ ভবনের বিভিন্ন তলায় অবস্থিত বিভিন্ন জায়গার নাম ও দিক নির্দেশের ব্যবস্থা করা গেছে।

কলেজের মানচিত্র প্রত্যেকটি তলায় দেওয়া আছে।

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি যে কথা
আমি যে বেকার পেয়েছি
লেখার স্বাধীনতা

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এক ভয়াবহ আর্থিক সংকট-এর মুখে রাজ্য সরকার।

বিস্তারিত তথ্য না দিয়েও বলি যে আমাদের কলেজের বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন দিতে রাজ্য সরকারের বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক তিন কোটি টাকা। নতুন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বর্তমানে সরকার নিয়োগ করতে পারছে না। অথচ কলেজ এদের ছাড়া অচল, অনেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিছু নতুন বিষয় খোলা হয়েছে। পরিচালন সমিতি আলোচনা করে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পরামর্শ মত ও কলেজের সাধ্যমত স্বল্প বেতনে কিছু লোককে নিয়োগ করা হয়েছে।

• ক্যাম্পাস ইন্টারভিউর মাধ্যমে কলেজ থেকে সদ্য পাশ করা কিছু ছেলেকে বেঙ্গল কেমিকেল, টাটা ইন্ডাস্ট্রিস, ইস্ট ইন্ডিয়া ফারমাসিউটিকাল প্রভৃতিতে চাকরির সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে।

আজ তারা কই সব? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক/পুকুরের জলে বহুদিন মুখ দেখে গেছে তার;/তারপর কি যে তার মনে হল কবে।/যখন সে ঝরে গেল, কখন ফুরাল, আহা — চলে গেল কবে সে নীরবে .../তাও আর জানি নাকো

— জীবনানন্দ দাস

শুনেছি কলেজের বারান্দায় সুন্দর গাছর সারি ছিল টবে। দেখেছি লোহার ভাঙ্গা রিং তাদের সাক্ষী বহন করে চলেছে। সব বারান্দা, বিভিন্ন জায়গায় সবুজায়ন চোখকে সামান্য হলেও কিছুটা শান্তি দেয়।

ভ্রমি বহু পথ, ঘুরি বহু দেশ
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু

দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া
ঘরের বাহিরে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অজানার রহস্য, অচেনার রহস্য জানতে চায়। মনকে কিছুদিনের জন্য শহর কলকাতা থেকে সরিয়ে নেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ সব সময়ই সহযোগিতার উষ্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া ...

গ্রাম বাংলা, বিভিন্ন শহর, বাংলাদেশ, নেপাল এই সব জায়গা থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বহু ছাত্র কলেজে ভর্তি হতে চায় প্রতিবারই। তাদের ছাত্রাবাস দরকার। কলেজে দুটি ছাত্রাবাস আছে। সংস্কার ও মেরামত অর্থাভাবে দীর্ঘদিন করা যায়নি। এখন দুটি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কোন অভিযোগ নেই। দুটি ছাত্রাবাসই মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা —

কলেজের গুণগত মান নির্ধারিত হয় ছাত্রছাত্রীর পঠন পাঠন-এর দ্বারা। পঠন পাঠনের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ক্লাস ছাড়াও সেমিনার করা হচ্ছে। অধ্যাপক অধ্যাপিকারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কলেজের পঠন পাঠনকে বিঘ্নিত না করে সেমিনারে যোগদান করেন। শিক্ষাকর্মী ও ছাত্ররাও বিভিন্ন সময়পোযোগী সেমিনার করে যায় বিগত বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাশের হার ছিল আটানব্বই শতাংশ —

রক্তে আনো লাল
রাতের গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এই কলেজের বিভিন্ন অনার্স বিভাগের বেশীরভাগ ছাত্র ছাত্রীই কলকাতা বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। তবুও প্রতিযোগিতার দিকে দেখলে দেখা যায় অনার্সে ভাল করা সত্ত্বেও সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে চিন্তা করেছে। আমরা যে এম.এ./এম.এসসি. কোর্স খোলবার জন্য আবেদন করেছিলাম তাতে সাড়া দিয়ে পরিদর্শকমণ্ডলী কলেজ পরিদর্শন করে গেছেন। আমরা আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই কলেজে এম.এ/এম.এসসি কোর্স খোলা হবে।

এছাড়াও সময়পোযোগী স্নাতক স্তরে মাইক্রো বায়োলজি, মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম, বায়োকেমেস্ট্রি, মলিকিউলার বায়োলজি কোর্স খোলার কথা চিন্তাভাবনার মধ্যে রাখা আছে।

আমরা কিছু দিনের মধ্যেই কলেজের খুব কাছে ১৮টি ঘর ও অনেকটা ফাঁকা জায়গা নিয়ে একটি ত্রিতল বাড়ি কিনবার পরিকল্পনা করেছি যা আগামী দিনে এম.এ/এম.এসসি পড়াবার কেন্দ্রবিন্দু হবে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কলকাতার কাছে বেশী পরিমাণ জমির জন্য আবেদন করা হয়েছে।

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আশুতোষ কলেজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম নব মূল্যায়ন পদ্ধতিতে NAAC (National Assesment and accreditation Council)-যা হল UGC-র একটি Autonomus Body তার দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে। এই কাজে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের মিলিত প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ব্যাপার। বিস্তারিত তথ্যে না গিয়েও শুধু বলছি NAAC পরিদর্শকমণ্ডলী তিন দিন ২৬, ২৭ ও ২৮ শে আগস্ট ২০০২ কলেজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করে তাদের অভিমত জানিয়ে গেছেন। পঠন পাঠনে গুণগত মান, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের যোগ্যতা, ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা, বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের গবেষণাপত্র, কলেজের পরিচ্ছন্নতা, পরিচালন পদ্ধতি ও পরিবেশ ও ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের মিলিত প্রচেষ্টা, পরিকাঠামো ইত্যাদিতে সন্তোষ প্রকাশ করে আশুতোষ কলেজ যে এক উৎকর্ষতার কেন্দ্রবিন্দুতে গেছে তারা তা ঘোষণা করে গেছেন।

তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে, আশুতোষ কলেজ শিক্ষায় স্বশাসনের উপযুক্ত। এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও আমরা গর্বিত যে শিক্ষায় স্বশাসনের কথা তখনই ভাবা হয় যখন সব দিক দিয়ে একটি কলেজ উৎকর্ষতার কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছায়।

তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বর পানে ...

পরিশেষে একটি কথা বলেই শেষ করছি, আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক উন্নত থেকে উন্নততর এবং শেষে উন্নততম আশুতোষ কলেজ।

অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

ছাত্র সংসদের সভাপতির কলাম

এক এক বছর করে বয়স বাড়তে বাড়তে আশুতোষ মহাবিদ্যালয় ৮৭ বছর বয়সে পদার্পণ করেছে। মানুষের জীবনায়ুর প্রেক্ষাপটে এই বয়স বার্ধক্যের হলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির আঙ্গিকে এই বয়স খুবই তুচ্ছ। একথা সত্য যে পরিচর্যার শিথিলতায় বেশভূষা কিছু কিছু সময় মলিন হয়ে পড়ে। আবার পরিচর্যার যাদু স্পর্শে সে নিজেই সজীব হয়ে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন সে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করতে উন্মত শির হয়। অনাকাঙ্খিত হলেও কিছু কিছু সময়ে পরিচর্যার বিঘ্নতায় তার প্রাণচঞ্চলতা অসাড় হয়ে পড়ে, যা কারও কাছেই কাম্য নয়। তাই আমাদের সকলের দায়িত্ব পরিচর্যার পথকে সুগম করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে আশুতোষ মহাবিদ্যালয়কে মহীরূঢ়ে পরিণত করা।

আজ যখন শত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যেও আশুতোষ মহাবিদ্যালয় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে নতুন পথের দিশারী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেখানে মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম অঙ্গ ছাত্র সমাজকে সর্বাগ্রে হাঁটতে হবে। কেননা ছাত্র-সমাজই বিশ্বসমাজের নিত্যকালের সর্বাপেক্ষা সজীবতম তথা বলিষ্ঠতম অংশ। তারা চিরকালের দুঃসাহসী। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন চূর্ণ করবার জন্যে তারা চিরপ্রতিশ্রুত। সেজন্য তারা কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকারে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি মৃত্যু বরণেও তারা পশ্চাৎপদ নয়। পৃথিবীর যেখানেই বন্ধন, মানবজাতির দুর্দশা, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন, সেখানেই ছাত্রদলের নির্ভীক উপস্থিতি।

তাই আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে সততা, নিষ্ঠা যেন সমাজের সকল স্তরের মানুষের আদর্শ হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখতে হবে। ■

অশোক কুমার রায়

বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষতা

'সেকুলারিজম' (ধর্মনিরপেক্ষতা) শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপে প্রথম চয়ন করা হয়েছিল এক ধরনের নৈতিকতার আদর্শকে বোঝাতে, যা ধর্মজাত অপার্থিব নীতির পরিবর্তে পার্থিব জীবনের মানবিক সুবৃত্তিকে প্রাধান্য প্রদান করে। ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে পৃথক করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে রাষ্ট্রের ধারণাকে অনেক জোরদার ও আত্মসচেতন ধারণায় পরিণত করেছিল ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম। রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করা ছিল এই ধারণার মর্মবস্তু। তবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গণতান্ত্রিক এই ধারণাগুলির জন্মের আগে। "পোপই ঈশ্বরের বাণীর একমাত্র ব্যাখ্যাকার" এই দাবির বিরোধিতার মধ্য দিয়েই শুরু হয় রাষ্ট্র থেকে ধর্মযাজকদের আধিপত্য অপসারণের প্রক্রিয়া। চতুর্দশ শতকে ইংলন্ডে ওয়াইক্লিফ এবং ষোড়শ শতকে জার্মানীতে মার্টিন লুথার, পোপের মতের বিরোধিতা করলেন। লুথারের নেতৃত্বে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন প্রচার করল ধর্মীয় অনুশাসনের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর ধর্ম বিশ্বাসের। লুথার দাবি করলেন, ঈশ্বর ও ব্যক্তি মানুষের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন অভাবনীয় ভাবে সাহায্য পেল এক নতুন দিক থেকে। হাতে লেখা পুঁথি হিসাবে বাইবেল তখনও পর্যন্ত ছিল যাজকদের কবলে। তার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে ধর্মযাজকেরা ধর্মভীরু মানুষের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে এই অবস্থায় ঘটল মৌলিক পরিবর্তন। লুথার যখন বাইবেলের ব্যাখ্যায় পোপের পরিবর্তে ব্যক্তির অধিকার দাবি করেছিলেন, তখন বাইবেল ছাপা হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তার সাথে পৌঁছেছে লুথারের বক্তব্য। এর ফলে ইওরোপে চিন্তার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হল, তা শুধু ধর্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ রইল না, তা ছড়িয়ে পড়ল শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানচিন্তায় — 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণের যুগের উন্মেষ ঘটল। গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠা এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রের উপর ধর্মযাজকদের আধিপত্য খর্ব করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪২) এবং গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। তার আগে পর্যন্ত ইওরোপে প্রচলিত ছিল পোপের মতবাদ — পৃথিবী ও মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে পৃথিবী এবং তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য সব নক্ষত্র। এতই দাপট ছিল চার্চের যে, কোপার্নিকাসের যুগান্তকারী গ্রন্থ "On the Revolution of the celestial orhs" মুদ্রিত হয় সেই বছর যে বছরে কোপার্নিকাস মারা যান; কোপার্নিকাসের মতবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য ৩৭ বছরের জিওর্দানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কোপার্নিকাসের তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করলেন। সেই অপরাধে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু এই ঘটনাগুলি যে বিতর্কের জোয়ার সৃষ্টি করল, তার ফলশ্রুতিতে দ্রুততর হল ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে রাজতন্ত্র ও চার্চের অপসারণ। যদি গ্রহনক্ষত্রের কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থান না থাকে, তবে ক্ষমতার কেন্দ্রেই বা কেন চার্চ ও রাজতন্ত্রের অধিষ্ঠান হবে? ১৬২৮ সালে প্রমাণিত হয় হার্ভের মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের তত্ত্ব, আবিষ্কৃত হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র। ইংলন্ডে স্থাপিত বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ১৫৭৯ সালে "গ্রেসাম কলেজ" — যা তারপরে একশ বছর ধরে ইংলন্ডে বিজ্ঞানচর্চার মূলকেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন হয়েছিল এবং যেখানে স্থাপিত হয়েছিল "রয়াল সোসাইটি"।

তাই দেখা যায় যে ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রক্রিয়ার বিকাশ আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার উন্মেষের প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করেছিল।

এমনতরো দৃষ্টান্ত মেলে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চায় বিভিন্ন শাখার মধ্যে শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র বা আয়ুর্বেদকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, যার মধ্যে ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারার বীজ (ডঃ দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও সমাজ)। অন্যান্য শাখাগুলিতে (যেমন জ্যামিতি বা জ্যোতির্বিদ্যা) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটলেও তার উদ্ভব ঘটেছিল পুরোহিতদের মাঝে, যজ্ঞের জন্য তিথি নির্ণয় ও যজ্ঞের প্রণালী উদ্ভাবনের তাগিদে।

আয়ুর্বেদের অগ্রগতি সম্পর্কে জানবার মূল উৎস "চরক সংহিতা" ও "সুশ্রুত সংহিতা"। অবশ্য ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রথম সূচনা ঘটেছিল "অথর্ববেদে"। অথর্ববেদের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে রোগ সারানো, আয়ুবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা। রোগ সারানোর সঙ্গে উদ্ভিদ ও ধাতুর মাদুলি, কবচের কথাও রয়েছে। এর সবটাই জাদুমন্ত্র নয়, অনেকটাই প্রাথমিক

বিজ্ঞান। "অথর্ববেদে" যা ছিল "দৈব-নির্ভর" ভেষজবিদ্যা, "চরকসংহিতা"য় তা বিকশিত হয়ে উঠল 'যুক্তিনির্ভর' ভেষজবিদ্যায়।

আয়ুর্বেদের মতে সফল চিকিৎসা নির্ভর করে চারটি বিষয়ের উপর (১) চিকিৎসক, (২) ওষুধ বা পথ্য, (৩) শুশ্রূষাকারী এবং (৪) রোগী। চিকিৎসকের যে গুণগুলি আবশ্যক সেগুলি হল (ক) চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, (খ) অভিজ্ঞতা, (গ) প্রায়োগিক দক্ষতা এবং (ঘ) পরিচ্ছন্নতা। ওষুধের আবশ্যিক গুণ হবে প্রাচুর্য, প্রয়োগের যথার্থতা, বহুমুখী ব্যবহার এবং কার্যকারিতা। শুশ্রূষাকারীর গুণগুলির মধ্যে রয়েছে শুশ্রূষাপ্রণালী সম্পর্কে প্রয়োগের জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা, রোগীর প্রতি যত্ন এবং সর্বশেষে রোগীর যে গুণগুলি থাকা প্রয়োজন তা হল স্মৃতিশক্তি, অসুবিধার দিকগুলি বলা, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা এবং সাহস।

লক্ষণীয় হল যে, চিকিৎসার সফলতা ব্যাখ্যা কালে কোথাও কর্ম ও নিয়তিবাদের ধারণার সাহায্য নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয় যখন নিয়তিবাদীরা বলে "চিকিৎসা করলে যেমন অনেক রোগী ভাল হয়, আবার অনেক রোগীর মৃত্যুও ঘটে। অন্যদিকে চিকিৎসা না করেও অনেক রোগী সুস্থ হয়, যেমন অনেকে মারা যায়। তাই কুয়ো, পুকুর বা নদীর জলে এক বিন্দু জল ফেলা বা বালিস্তূপের ওপর এক মুঠো বালি ছড়ানোর মতই অর্থহীন চিকিৎসার বিষয়টি" তার প্রত্যুত্তরে "চরকসংহিতা"য় রয়েছে "যেমন একজন দক্ষ তীরন্দাজ, যিনি নিয়মিত চর্চা করেন, খুব দূরে নয় এমন লক্ষ্যবস্তুকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে পারেন, তেমনই একজন দক্ষ চিকিৎসক উপযুক্ত নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন। তাই কখনই চিকিৎসা করা ও না করাকে সমতুল বলে গণ্য করা উচিত নয়।"

"ব্যাধি দুরকমের। রোগ্য ও দূরারোগ্য। যে চিকিৎসক এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যাঁর সম্যক ধারণা রয়েছে, সঠিক সময়ে রোগের চিকিৎসা করলে তাঁর সাফল্য অবধারিত।" আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মর্মবস্তু যেন বহন করছে "চরক সংহিতা"।

কিন্তু "চরকসংহিতা"র এই যুক্তিবাদী ধারণার বিকাশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার দর্শন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠল। বস্তুতঃ যাকে যজুর্বেদের সময়কাল থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রকে হেয় করা শুরু হয়, "অথর্ববেদ"কে নীচু মানের রচনা হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। "কথা উপনিষদ" ঘোষণা করে "যুক্তি দিয়ে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।" আর এক ধাপ এগিয়ে মনু ঘোষণা করলেন "Greet not even by words one who is a logician." অদ্বৈত শংকর বললেন, "যুক্তির একমাত্র কার্যকারিতা হল শাস্ত্রে যা বর্ণিত আছে তা প্রতিপন্ন করা" সমাজে চিকিৎসকের স্থান হল একেবারে নীচের সারিতে। বশিষ্ঠের কথা হল "যে দ্বিজ বেদ জানে না তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। অন্যদিকে যে ব্যবসা করে বা অভিনয় করে জীবিকা নির্বাহ করে কিংবা যে ব্যক্তি চোর বা যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে জীবিকা বহন করে, তারা ব্রাহ্মণ হওয়ার উপযুক্ত নয়।" সমাজে চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা করা নির্দিষ্ট হল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জন্য। তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ ঘটল, চিকিৎসাবিজ্ঞানের সার্বিক অবক্ষয় স্পষ্টতর হয়ে উঠল। কর্মের ভিত্তিতে নয়, জন্মের ভিত্তিতে বর্ণাশ্রম প্রথা জাঁকিয়ে বসল, নিয়তিবাদের দর্শন প্রবল হয়ে উঠল।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ইতিহাসের সাথে পরিচয় তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। একুশ শতকের দোরগোড়ায় আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির কালেও যখন আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে রত হয়, তখন আগামী দিনে এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির সামনে বিপদের আশংকা করা অযৌক্তিক নয়। ইতিমধ্যে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই রাজনৈতিক দল পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনের মাধ্যমে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক ও সংকীর্ণ ধারণা দেশের শিশু ও কিশোরমনে সঞ্চারিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। স্কুল পর্যায়ের শিক্ষণে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চলছে। একটি প্রজন্ম বড় হয়ে উঠবে, যাদের স্মৃতিতে অতীতের সংহতিপূর্ণ ঐতিহ্যের কোন চিহ্ন থাকবে না; যে তথ্য তারা শিখবে, যে ধারণা তাদের জন্মাবে সত্যের দিক থেকে, বাস্তবের দিক থেকে তা ভিত্তিহীন। এইসব বইগুলি ইতিমধ্যে ২০,০০০ বা তারও বেশি বিদ্যালয় এবং শিশুমন্দিরগুলির পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশের সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে এইসব বইগুলি পড়ানো শুরু হয়েছে। ফলে মিথ্যা ও বিষাক্ত জ্ঞানের শিকার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শিশু। এই বইগুলি থেকে ছাত্রদের যা শেখানো হবে তার কতকগুলি নমুনা হল —

— হোমার বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করে ইলিয়াড নামের একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।

— আমেরিকার অধিবাসীদের ভাষা ভারতীয় ভাষার থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

— যীশুখ্রীষ্ট হিমালয় পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং হিন্দুধর্ম থেকেই তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন।

— "অথর্ব পরিশিস্টের" ষোলোটি গণিতসূত্র থেকে পৃথিবীর তাবৎ গাণিতিক কাজ ও চর্চার সব সূত্র মেলে।

— বর্তমানে বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটেছে পাশ্চাত্যে, তার সবেরই সূত্র ছিল প্রাচীন আর্য শিক্ষায়।

এধরনের ভুল, বিকৃত ইতিহাস মিলিয়ে এদেশের ছেলেমেয়েদের মূর্খ করে রাখার এই ভয়ংকর অপপ্রয়াস চলছে। নানা প্রসঙ্গে সংঘ পরিবার থেকে ঘোষিত হচ্ছে, "ভারতবর্ষে সিন্ধুসভ্যতা প্রাগার্য নয়, আর্য এবং বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা।" পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁদের প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে তাঁরাই জানেন প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে বৈদিক সভ্যতা কনিষ্ঠতম, বৈদিক সভ্যতার শুরু খুব বেশি হলে খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছরও নয়, অথচ তার চেয়ে তিন থেকে পাঁচ হাজার বছরের বড় হল আসীরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, চীনা ও গ্রীক সভ্যতা। শুধু তাই নয় সংঘ পরিবার বলে চলেছে যে, বৈদিক আর্য সভ্যতা শুধু প্রাচীনতম নয়, অন্যান্য সব সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদের এক শিক্ষক সমাবেশে বলেন যে, "ভারতে যা কিছু খুব প্রাচীন, ঠিক সবই বর্তমান জগতে আধুনিকতম।" উত্তরপ্রদেশের স্কুলে গণিত বইতে বৈদিক গণিত অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এন.সি.ই.আর.টি. নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, "এর মাধ্যমে গণিত বিদ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হবে এবং জ্ঞানের এই মৌলিক শাখাটিতে ভারতের অবদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তৈরি হবে না। কেবল তাই নয়, এর দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে সংকীর্ণ ধারণাও তৈরি হবে যা ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।"

২০০১ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষবিদ্যাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞানবিরোধী অবস্থান স্পষ্টতর করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "জ্যোতিষশাস্ত্রে যে কারণে অধিকাংশ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন না, তা' হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে পাওয়া তত্ত্বের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।" আজ থেকে বহু বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন "তোমরা দেখবে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং হেঁয়ালিপূর্ণ জিনিসগুলো সাধারণতঃ দুর্বল মস্তিষ্কের লক্ষণ। সুতরাং যে মুহূর্তে এগুলি মনে দানা বাঁধছে, আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, আর উচিত একটু ভাল খাবার খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া।"

যুক্তিবাদী চিন্তাধারার উপর আক্রমণের সবচেয়ে সুসংহত প্রকাশ এবং সবচেয়ে মারাত্মক রূপ হল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জীবন। এই সাম্প্রদায়িক বিচারধারার গোড়ার কথা হ'ল, 'দৈনন্দিন বাস্তব পার্থিব অস্তিত্ব নয়, "হিন্দু", "মুসলমান", ইত্যাদি নামক কতকগুলি ভাবগত সমূহ।' এই ধারণার বিপজ্জনক প্রকাশ ঘটেছে গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। সেখানে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের উপর সংগঠিত আক্রমণ রাষ্ট্রের আনুকূল্যে সংগঠিত হয়েছে, যার তুলনা মেলে হিটলারের জার্মানীতে ইহুদিদের উপর অত্যাচারের সাথে।

তাই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করা, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা — এগুলি কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্যই জরুরী নয়, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষার অস্তিত্বের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়। □

অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁ

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিদায় অভিনন্দন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষ

গত শতাব্দীর শেষ চার দশক ধরে আমার দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তার ভিত্তিতে তোমাদের একটা কথাই বলতে পারি ঃ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ যারা পেয়েছে তাদের জীবনে 'কলেজ পর্যায়'-এর এই তিনটি বছর হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়; সুতরাং কোনমতেই যেন এই সময়টা 'হেলাফেলা'য় হারিয়ে না যায়।

যারা আজ প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী তারা ২০০৪ সালের শরৎকালে অনুভব করবে — তিনটি বছর যেন বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করে এল। যদি তুমি অতিক্রমণের প্রতিটি স্তরে যথাসম্ভব সচেতনভাবে সময়গুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারের চেষ্টা চালিয়ে থাক, তবে তো ভালই; নতুবা অপব্যবহার হয়ে থাকলে ঐ তিন বছর আর ফিরে না পাওয়ার নিদারুণ কষ্ট সারা জীবনের ব্যথার কারণ হয়ে থাকবে।

কলেজের তিন বছর যেহেতু আমার বিচারে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোত্তম সময় তাই এই সময়গুলো ব্যবহারকালে তাদের কাছে আমার প্রধান আবেদন : কোন সঙ্কীর্ণ হিসাবী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী যেন তাদের কাজে, আচার-আচরণে, প্রাধান্য না পায়। একটা প্রাণখোলা হাসি, উদার হৃদয় এবং জানবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন তাদের প্রতিদিনকার জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

ইদানীং কিছু হিসাবী মানুষ কিছু হিসাবী মনোভাব এর ছেলে মেয়ে তৈরি করছে। তারা বলছে — কোন বিষয়টা পড়লে এবং কীভাবে কত কৌশল করে পড়লে দ্রুত কত বেশি টাকার চাকুরী মিলবে। "বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন নিষ্প্রয়োজন" বা "চাকুরীর জন্য অত চিন্তার কিছু নেই" — এমন কথা নিশ্চয় আমি বলছি না। কিন্তু তাই বলে বাকি জীবনটার মত এই সুন্দর কলেজ জীবনটাও কেবল টাকার চিন্তাতেই কাটিয়ে দেব এটা ভাবা যায় না। আমি তোমাদের এটা না ভাবতেই পরামর্শ দিচ্ছি। তিন বছর পর এটা ভাবার অনেক সময় পাবে। বরং দেখবে যদি এই সুন্দর পর্যায়টা আনন্দ করে এবং খোলা মন ও অতৃপ্ত জ্ঞানলিপ্সা নিয়ে কাটাতে পার তবে দেখবে পরবর্তী কালের হিসাবগুলো অনেক সহজ হয়ে পড়েছে।

কোন ছাত্র বা ছাত্রী সৎ স্বভাবের; পড়াশুনা, কাজকর্মে খুব নিষ্ঠা — এ সব বললে যেন হাসির ব্যাপার হল। সততা যেন বোকামী; বেশি পরিশ্রম না করে নকল করে পরীক্ষা পাশ যেন বুদ্ধিমানের পরিচয়! আমি আবার আবেদন করব (নিছক উপদেশ/পরামর্শ নয়), আবেগ নিয়েই বলব — ঐসব সস্তা চালাকি বা বাহাদুরী দেখানোর রাস্তায় যেও না; প্রকারান্তরে নিজেই ঠকে যাবে। (তিন বছর পর যখন কোনমতে পাশ করে বেরোবে (যখন দেখবে তোমার জ্ঞান ভাণ্ডারে তেমন কিছু সঞ্চয় হয়নি) তখন চারপাশে কোন পুরানো সাথীকেও পাবে না। উপরন্তু দুরন্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশে নিজেকে অপটু, অক্ষম, মনে হবে।

যদি ইউনিয়ন কর তবে এমন কিছু করে দেখাবে যেন ২/৩ বছর পর নতুনেরা এসে বলে, হ্যাঁ — আগের দাদা দিদিরা কিছু ভাল কাজ করেছিল বটে! ধর খুব সুন্দর এবং নতুন ধরনের কলেজ ম্যাগাজিন তৈরি করলে; বা কলেজ কমন রুম ভাল করে সাজালে — নতুন আইটেম কিছু যোগ করলে; খেলাধূলা বা নতুন সাংস্কৃতিক কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হল। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় যুক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে (আমি দায়িত্বে থাকাকালীন যেমন বহুদিন পরে কলেজের ফুটবল টিম বিশ্ববিদ্যালয় শিল্ড জয় করে এনেছিল)। মোট কথা যদি ইউনিয়ন চালাবার দায়িত্ব নাও, তবে তোমার সময়কার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দাগ কেটে আসার মত কিছু ভাল এবং বড় কাজ করবে।

আমরা ছাত্রজীবনে একটা কাজ নিয়মিত করতাম — খবর রাখতাম কোথায় কোন মানুষটি (কোন শিক্ষক, গবেষক বা ফ্রিলান্সার) কি বিশেষ বিষয় নিয়ে লিখছে বা বলছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা যোগাড় করে পড়ে নেওয়া বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সেই মানুষটির বক্তব্য শুনে নেওয়া এবং বোঝার চেষ্টা করা। হয়ত সব লেখা, বা বক্তৃতা নিশ্চয় সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একইভাবে আকর্ষণ করতেও পারে না। কিন্তু ওই ছুটে যাওয়ার অভ্যাসটা, ওই সব নতুন লেখা বা বক্তব্য সংগ্রহ করার প্রবল আগ্রহ, আমাদের পরবর্তী জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আমি আশা করব, তোমরাও কলেজ পর্যায়ে এই আগ্রহ, এই অভ্যাসটা গড়ে তুলবে।

অনেক জানলে বা অনেক ভাল কাজ করলে যে অনেক কিছু তুমি পাবে (অর্থ বা কোন পুরস্কার) এমন আমি বলছি না। তবে কিছু না জানলে বা কোনই কাজের কাজ করতে সক্ষম না হলে যে কোন পুরস্কার কখনই মিলবে না এটা প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। অথচ সৎ ও নিষ্ঠাবান ছাত্রী-ছাত্র একেবারে কিছুই না পেয়ে বসে আছে এটা ঘটনা নয়। হয়ত অল্প কিছুকাল সে কর্মহীন থাকতে পারে। কিন্তু যদি সে নির্দিষ্ট একটিমাত্র চাকুরী পাওয়ার জন্যই ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে না থাকে তবে সে কোন না কোন ধরনের

একটা কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারবেই।

বেকারত্ব আজকের দিনে একটা প্রধান সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের সময়ের তুলনায় এখনকার সমাজে কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে; নানাধরনের কর্মসংস্থান, উপার্জনের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। তার জন্যে প্রয়োজন চোখ কান খোলা রাখা — কম্পিউটার প্রযুক্তি (ইন্টারনেট ইত্যাদির) সাহায্য নিয়ে বহু বিচিত্র কর্মসংস্থানের খবর সংগ্রহ করা এবং সেইমত নিজেকে প্রস্তুত করা। এক কথায় আজকের দুরন্ত গতিশীল সমাজে তোমাদের জীবন-মন-এ গতিময়তা আনতে হবে এবং তা করা সম্ভব সৎভাবেই, সুন্দরভাবেই। সততার একটা আলাদা আনন্দ আছে। তুমি যখন জান তুমি কোন মানুষকে জেনেশুনে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করনি, সচেতনভাবে কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করনি, উৎকোচ গ্রহণ করনি, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ বা কোন বিশেষ সুযোগ সংগ্রহ করনি — তখন তোমার মনে কিন্তু একটা অনির্বচনীয় আনন্দের ভাব আসবে। ওই আনন্দটাই সুন্দর, আর ঐ আনন্দ-সুন্দর মন তোমার মধ্যে এনে দেবে একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস, যে আত্মবিশ্বাসের জোরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই তোমার গতিময়তা (mobility) পরিচালিত করা সম্ভব।

আবার বলি, কলেজ জীবনের এই তিন বছর যেন তোমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অতি প্রয়োজনীয় ঐ আত্মবিশ্বাস (self-confidence) গড়ে তোলার পর্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হয়। □

হিন্দু ও মুসলমান দেবতা ঃ বিরোধ-সমন্বয়ের কাহিনী

দ্বাদশ শতকের শেষে বাংলায় তুর্কী আক্রমণের পর থেকে ইসলাম এ দেশে শুধু ধর্ম নয়, একটা সামাজিক শক্তি হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কার নিয়ন্ত্রিত হিন্দুসমাজের নীচের তলার অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ অবহেলিত ও অবমানিত মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নানা কারণে। ফলে বাংলার জনমানসের একটা খুব বড়ো অংশ ইসলামের অনুগামী হলো।

এই যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তাঁরা কিন্তু নিজেদের এবং তাঁদের উত্তরপুরুষেরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের পূর্বতন সংস্কারের নানান স্মৃতিকে বজায় রাখার প্রয়াস করেছিলেন, ফলে পূর্বতন ধর্মবিশ্বাসের অবশেষ কোনোদিনই অবলুপ্ত হয়নি। তাই এক ধরনের সমন্বয় ঘটানোর মানসিক প্রস্তুতি সব সময়েই ক্রিয়াশীল ছিল। আবার তারই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বটাও ছিল অনিবার্যরূপে। দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের এই যৌথ ফলশ্রুতিতেই বাঙালীর সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে হিন্দু ও মুসলিম ভাবধারার এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো যার মধ্যে বিরোধ এবং সহাবস্থান দুই-ই বিদ্যমান ছিল।

বর্তমান আলোচনায় অবশ্য শুধু সেই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীদের প্রসঙ্গই আসবে, যাঁরা একই সঙ্গে দুই সম্প্রদায়েরই উপাস্য। এঁদের মধ্যে আছেন বনবিবি, বড়খাঁ গাজী, দক্ষিণরায়, ওলাবিবি, মানিকপীর, সত্যপীর, গোরাচাঁদ পীর প্রমুখ।

দক্ষিণবঙ্গের মানুষরা বলেন যে বনবিবি হলেন মুসলমান ফকিরের মেয়ে আর আমাদের এই আঠেরো ভাটির সব মানুষের (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে) মা। বনবিবি, বড়খাঁ গাজী, দক্ষিণরায় এবং তাঁর মা নারায়ণীকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের মানুষদের মধ্যে একটি লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে যেখানে বলা হয়েছে দক্ষিণরায় এবং বড়খাঁ গাজীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষে বনের বাঘেরা যুদ্ধ করতে এসেছিল। অবশেষে স্বয়ং ঈশ্বর (কোনো কোনো বয়ানে নারদ) একহাতে কোরাণ, অন্যহাতে পুরাণ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেন।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমাজে (এমনকি নিরক্ষরদের মধ্যেও) এই জাতীয় নানান লৌকিক কাহিনীমালার ব্যাপক প্রচলনের সূত্রেই এই দেবদেবীদের ধর্মমত নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কথা জানা যায়। লক্ষণীয় যে, মুসলিম ধর্মে মূর্তিপূজা অবিহিত হলেও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দক্ষিণবঙ্গের অরণ্য অঞ্চলের মানুষ বনবিবি, বড়খাঁ গাজী এবং দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর মূর্তি পূজা করেন।

ওলাবিবিকে নিয়ে সেভাবে কোনো কাহিনী প্রচলিত না থাকলেও তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই মান্য করেন। ওলাবিবি ও তাঁর ছয় বোন একসঙ্গে পূজিত হন — এই দেবী গুচ্ছ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম ধর্মের অন্তর্গত বলে গণ্য হন; যেখানে ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, আসানবিবি, আজগইবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, এবং ঝেঁটুনীবিবি নামে তারা পরিচিত। এঁরাই আবার বাঁকুড়া, বীরভূম এলাকায় হিন্দুদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তখন বহু সময়েই তাঁরাই রঙ্কিনী, শনকিনী, চমকিনী, ব্যশুলি, বিলাসিনী, চণ্ডী, জামমালা নামে পূজিত হন। সাধারণভাবে এঁরা সাতবোন বা সাতবউনি বলে পরিচিত হিন্দু মুসলিম ধর্মসমন্বয়ের বিচিত্র উদাহরণ হিসেবে এঁদেরকে গণ্য করা যায়। আসলে এই সাতবউনি তথা ওলাবিবিরা অনেকে বিভিন্ন ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী। তাই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এঁদের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করেন ব্যাধি-নিরাময় ও প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা করে।

দক্ষিণবঙ্গে যে অজস্র পীরের কথা কিংবদন্তী রূপে প্রচলিত আছে, তাদের সকলের সম্পর্কেই মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হিন্দুদেরও একটি বিশেষ ভক্তির মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মানিকপীর, সত্যপীর এবং পীর গোরাচাঁদ। বড়খাঁ গাজীও মূলতঃ পীর হিসেবেই স্বীকৃত ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি দেব-পদবীতে উন্নীত হয়েছেন। এরা এবং অন্যান্য পীর প্রমুখ হিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য হয়েছেন যে, তার অন্তরালে সুফীবাদের একটা খুব বড়ো ভূমিকা আছে। আবার এই পীরেরা গোঁড়া মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই বিবিধ কারণে এঁরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মানিক পীর মূলতঃ হিন্দু গোয়ালাদের দ্বারাই পূজিত হন এবং এঁকে তাদের গো-সম্পদের অধিরক্ষক বলে মনে করা হয়। তবে মানিকপীরের পালার গায়ক এবং শ্রোতাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরাই অসংখ্য ছিলেন।

পীর গোরাচাঁদকে মুশকিল আসান মনে করা হয়। এককালে এঁর অনুগামী ফকিররা ধর্মমত নির্বিশেষে পল্লীর বাড়ি বাড়ি ঘুরে সকলের মুশকিল আসান কামনা করে তাঁর বন্দনাগান গেয়ে বেড়াতেন।

দক্ষিণবঙ্গের এই সব সন্ত-ফকির তথা পীরদের মধ্যে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন সত্যপীর যিনি নামান্তরে সত্যনারায়ণ বলেও পরিচিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের পরিবারগুলিতে যথাক্রমে

সত্যনারায়ণের পূজা ও সিন্নি দেওয়া এবং সত্যপীরের সিন্নি মানত করার রীতি বহুল প্রচলিত। আরো উল্লেখযোগ্য যে এঁর সম্পর্কে উভয় ধর্মাবলম্বী কবিরা যত কাব্য রচনা করেছেন, সেখানে এক বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর অভিন্ন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও সত্যনারায়ণের পূজার অভিচারের মধ্যে বিষ্ণু ও নারায়ণের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে মোকাম এবং ক্ষুদ্রাকার লৌহনির্মিত অস্ত্র ইত্যাদি মুসলমানী উপকরণ ব্যবহার করেন। সত্যনারায়ণ তথা সত্যপীরের নামে প্রচলিত প্রায় সমস্ত কাহিনীগুলির মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অধর্মীর শাস্তি এবং ধর্মাত্মার মঙ্গলমূলক গল্প বর্ণিত হয়েছে।

বাংলার লৌকিক সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধন সবচেয়ে নিবিড়ভাবে ঘটেছে বাউল কবিদের গানে। বাউল ধর্মের মধ্যেই একটা সামঘয়িক চরিত্র আছে। মুসলিম সুফী সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণবীয় সহজিয়া তত্ত্বের সম্মেলনে বাংলার জনজীবনে এই বাউলধর্ম গড়ে উঠেছে। লালন ফকির, মদন বাউল প্রমুখ বাউল গুরুরা তাঁদের গানের মধ্যে ধর্মভেদহীন এক শাশ্বত মানবিকতার তত্ত্বকে প্রচার করেছেন। হিন্দু-মুসলিম ভেদহীনতার সত্যটিকে প্রচারের ফলশ্রুতি হিসেবে বাউল কবি মনে করেছেন, শেষ সিদ্ধান্তে মানবধর্মই একমাত্র পালনীয়। তাই লিখেছেন ঃ "নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।"

একদিকে যেমন সন্তরা এই ধরনের সমন্বয়ের বোধ তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রচারের মাধ্যমে সমাজে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, আবার অনেকে গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের মতো সম্প্রদায়গত বিদ্বেষও প্রচার করতেন, ফলে স্বাভাবিকভাবে দ্বন্দ্বও ঘটেছে এবং সমাজবিবর্তনের দ্বান্দ্বিক সূত্রানুযায়ী অনিবার্যভাবে একটা সমন্বয়ও সৃষ্টি হয়েছে কিছুকাল পরে। কখনো দ্বন্দ্ব, কখনো সমন্বয় — এই ক্রমবিবর্তনের ফলেই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক চেহারাটা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে — সেটুকুই বক্তব্য কথাসাঙ্গে। ■

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

Of Lakes and Bridges And Yaks and Leeches

'Ma, ogulo ki?' asked little Rumi, her voice filled with wonder. 'Ogulo yak, ek dharoner goru, pahare thake,' replied Moum, following her daughter's gaze. From the snug interior of the *commander* vehicle the rest of us turned to look in the same direction. A group of shaggy bovine creatures was grazing in the distance, amid yellow, frost-bitten grass. We – our group of six friends – along with a family of three – Moum, her husband, and their daughter Rumi – were on our way to Lake Tsango, 35 kms north east of Gangtok, and Nathu La, another 17 kms away near the Indo-Chinese border. Muffled up in our jackets and woollen scarves we were drinking in the beauty of the bright blue sky and the snow-clad mountains, dazzling and brilliant in the morning sun. We seemed to have forgotten that other local attractions, albeit less sublime, existed closer to the ground. Now, thanks to Rumi, we had our first glimpse of yaks, those animals distinctive of and unique to the central and eastern Himalayas.

It was the height of summer and we had left Kolkata, then sweltering in the heat and humidity of late May, for the cooler climes of North Bengal and Sikkim. Our first stop had been Darjeeling, congested, grimy, yet managing to retain its quaint charm as the 'Queen of hill stations'. Sprawled over the hills the slopes of which are one green carpet of tea gardens, 'Darj' welcomed us with its myriad attractions – the Mall, the Zoological and Botanical gardens, the Himalayan Mountaineering Institute, the ropeway, a glorious display at this time of the year of azaleas, poppies, roses, orchids, wildflowers, and of course, the majestic Kanchenjunga (hidden behind a curtain of mist for the greater part of our stay). From Darjeeling we had come to Gangtok after a five hour long jeep drive through the mountains with the Teesta for company. Lunch was a hurried affair giving us just enough time to take in the local sights – Enchey monastery, Institute of Tibetology, the Orchidarium, Tibetan Handicraft Centre, and Tassi View Point. Now, in a few minutes time, we would be reaching Tsango Lake (approximately 3774m above sea level), where, our guide assured us, we would not only see more yaks but would also be able to ride one if we wanted to. We could hardly wait to reach the place.

Tsango proved to be a heady experience – the sunlight glinting on the snow-covered mountainsides, the sapphire-like brilliance of the lake, the soft snow piled all around us like a white blanket, the yaks all gorgeously, even garishly decked up in colourful patchwork quilts with bells dangling from their necks. After many 'Oh!'s and Ah!'s and other spontaneous exclamations of delight, all the while clicking merrily away on our cameras, we followed little Rumi's example and did what seemed most natural in the circumstances – made snowballs and hurled them at each other. And, we were not the only ones – other tourists were also engaged in snowball-hurling sessions – even as the locals – shopkeepers and yakwallahs – smiled indulgently at our antics. Yak rides seemed to be popular and we decided not to miss out on the opportunity of sitting astride the gaudily decorated though menacing looking beasts. Soon it was time to leave Tsango and move further up into the mountains to Nathu La where our brave jawans keep constant vigil on the Indo-Chinese border in the most inhospitable conditions. The road to Nathu La was, however, closed to civilians as a military conference was in progress. Back once more on the Tsango waterfront, we drowned our disappointment in cups of hot tea accompanied by plates of steaming momos. On the return journey to Gangtok

we stopped at the majestic Kyngnosla Falls cascading down the mountainside and spraying us with jets of ice-cold water. Back in the city, we spent the evening in Lal Market, doing a spot of shopping.

Loleygaon, that place with the most musical of names, was where we relaxed after the hectic rigours of Darjeeling and Gangtok. Locally known as Kaffer, Loleygaon is a tiny settlement clinging to a ridge, 1707m (approx.) above sea level, south of Kalimpong and reached via a long drive through the dark forest. In the late afternoon, no vehicle will take tourists to Loleygaon because the journey back to Kalimpong in the falling dusk is too risky, and positively eerie, for a lone driver.

When we reached Loleygaon, what we noticed first were the tremendous forests sheathing the hills. Visitors to the place are pleasantly greeted by endless greenery, the most inviting scenery including a view of the distant Kanchenjunga range when the sky is clear, beautiful trails for hiking, and in front of every house, the usual gift of the mountains – flowers, both wild and cultivated. Presiding over nature's bounty is the 'sound of silence', into which mingles the distant tinkling of cowbells at twilight. At a little distance away to the south from our lodge – Dafey Munal – we came to a place overlooking a valley brimming with dense jungle, and in the far distance, a view of the haze shimmering over the burning plains.

On our second day at Loleygaon, we went out most enthusiastically to botanise, and returned to the lodge laden with a varied collection of pine cones, tufts of grass and ferns, strangely patterned leaves, wild strawberries, and even some species of plants (which, contrary to our expectations, are flourishing in the city). And, without exactly planning to, we also collected several bloodthirsty leeches with which the place is infested. We had been exploring, in a dim corner of the forest, an extremely long hanging bridge, one of the chief attractions of Loleygaon. Several offshoots from the bridge led to machan-like observation points. Escorted by a local mongrel which had taken a fancy to us, we traversed its length, and then, in an unfortunate moment, decided to make the return journey on the solid ground where the fallen leaves formed an attractive grey-gold carpet. Within minutes, the leeches were all over our feet. We needed our entire supply of salt (each of us was carrying little containers of the substance) to get rid of them. We trudged back to the lodge, a wiser and sadder lot.

In Loleygaon, as later in Lava, the weather gods smiled upon us. We got one or two spells of rain, but they were mercifully brief. In fact, with its quick alternations of rain, mist, and brilliant sunshine, the weather was entirely characteristic of the Eastern Himalayas. The utter changeability of the weather made it seem as though three seasons had been squeezed into one day.

Lava at an altitude of 2195m (approx.), shrouded in fog and mist, lay last on our itinerary. It is a fairly large town compared with Loleygaon, with its own Tibetan monastery and a well-maintained Nature Interpretation Centre, perched strategically on a jutting hillside. Lava is also the starting point for treks into the Dooars, in particular the vast Neora Valley National Park that stretches right up to the Sikkim-Bhutan border. The fog seemed denser than in Loleygaon, the forest even more damp. Our abiding memory of Lava is of the strains of 'Buddham Sharanam Gacchami' wafting through the early morning air from the monastery. It was followed by the plangent notes of pipes and horns so typical of the music that one associates with Tibetan monasteries.

A day later we, the 'chhay katie' (six girls) as the locals dubbed us, left the hills, the forests, and the flowers. But the air of the mountains is still fresh upon us. It is as though we have never been away from the high places, the lonely places. ■

Paromita Chaudhuri
Mahjabeen Jahan,
Sraboni Roy

INCOMPLETE GLOBALISATION

The word 'globalisation' is a derivative of the word 'Global' which indicates the quality of relating to the whole world.

Globalisation, which is a noun derivative of the adjective 'Global', therefore, names the relating of a part (a country) to the whole of the world.

To be technically specific, globalisation indicates growing intensity and spread of international transactions.

In strict economic terms, globalisation refers to the opening up of national markets to the entire world.

Hence, the benefits of globalisation actually boils down to the benefits of free markets, the prominent among which are under :–

(1) Free trade provides an outlet for the surplus output of a nation. In other words it expands the market for the products of a nation and hence provides unbridled returns to the factors required to produce them.

(2) Free trade serves as an engine of growth by increasing national or aggregate output and income, by raising national savings (which bear a direct relation to national income) and consequently by raising investment – the much acclaimed source of growth.

(3) Free trade widens the consumption horizon of the residents of a nation, introduces new and better quality goods to them inspite of the resource limitations. In other words, free trade enables people to consume what they cannot produce. For the countries not having oil-wells can use oil due to free trade.

On the political front globalisation is considered the greatest contributor to international peace and stability as it promotes greater and better understanding and interaction among people of the different nations of the world.

But the point to ponder is, 'Is globalisation an unmixed blessing'?

While globalisation calls for free flow of goods and capital across countries, it does not allow free movement of labour (especially unskilled) across national boundaries.

As a result, the labour-abundant, capital-poor LDC's cannot benefit by exporting and marketing their surplus labour in the service sectors of the labour-scarce advanced countries.

Only if free flow of labour is allowed across countries, the benefits of globalisation will percolate to the poor of the third world whose rising incomes will, in turn provide a growing market for the products, even of the advanced nations. ■

PROF. ARUNDHATI CHANAK

তোমার পাশেই আছি

এই তো, তোমার পাশেই আছি
খোলা জানালা দিয়ে আলো আসছে ঘরে
বিছানায় আলো বলের মতো ঘুরছে হওয়া নিয়ে
ছোটবেলায় এরকম আলো পেলে
বুকের মধ্যে মুঠো ক'রে ঘুমিয়ে পড়তাম
এখন এই রাতে, তোমার পাশেই আছি
ইচ্ছে হচ্ছে এখনো বলি, তোমাকেই চাই
তোমাকেই ভালবাসি
কিন্তু পারছি না, পারছি না কেননা ওরা তাড়া ক'রে
ফিরছে আমাদের
তুমিও কি পারছ? তোমারো কি ইচ্ছা হচ্ছে না?
আসলে অই 'ভালোবাসা' শব্দটা কিছুতেই
বেরুচ্ছে না গলা থেকে
গলা থেকে ঠোঁট নীল হ'য়ে যাচ্ছে
একটা ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে পোষা হিংস্র কুকুরের
আমার ভয় করছে, তোমারো কি ভয়?

কথা না ব'লে মনে মনে একটা কবিতার কথা ভাবলাম আমি
কিন্তু যতবারই 'ভালোবাসা' শব্দটা দিয়ে সাজাতে চাইছি
শব্দটার ওপরে জ'মে বসছে থিকথিকে রক্ত
মুছে আবার বসাতে চাইছি, শব্দকে ঘিরে
লেপটে যাচ্ছে পোড়া মাথার লেপটে-থাকা চুল
পেট থেকে উথলে-আসা নাড়িভুড়ি, কাটা-হাত
ছালছাড়ানো মাংস, উপড়ে-তোলা চোখ
ছারখার করা তলপেট আর যৌনাঙ্গ
সবশেষে 'ভালোবাসা' শব্দটার মধ্যে সেঁটে যাচ্ছে
গলা-কাটা আস্ত একটা মাথা

নীলা, আজ আর তোমাকে 'ভালোবাসা' শব্দটা বাজিয়ে
শোনাতে পারবো না আমাদের রাতের রবিশংকর
ওরা তাড়া ক'রে ফিরছে আমাদের
খুব ছোটো হ'য়ে আসছে রাত
খুব ছোট হ'য়ে আসছে আমাদের ভালোবাসা

তবু তোমার পাশেই আছি
তুমি কি বুঝতে পারছ না? সবকিছু
ফুরিয়ে যাবার শেষ পর্যন্ত
এই তো, তোমার পাশেই আছি, তোমার পাশেই

অমলকান্ত চক্রবর্তী

সূচীপত্র

কবিতা

■ বৃদ্ধ কবি আপনাকে	অর্ক রাজ পন্ডিত	২২
■ ক্রিকেটার প্রহসন	সৌরভ নন্দী	২২
■ এক মুঠো জীবন	অর্পিতা চক্রবর্তী	২২
■ এক যে ছিল দেশ	শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত	২৩
■ তাদের উদ্দেশ্যে	অরিন্দম মন্ডল	২৩
■ সংকট	শমীক বিন্দু	২৪
■ শারদীয়া	শুভ্রাংশু বশিষ্ট	২৪
■ আমি সেই মেয়ে	কৃষ্ণেন্দু ঢ্যাং	২৫
■ মুখোশ	সুরজিৎ দে	২৫
■ না দেখা পুজো	শাশ্বতী মান্না	২৬
■ ভুলিনি তোমায়	সৌমাভ ভট্টাচার্য্য	২৭
■ স্বপ্ন দেখি	নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য	২৭
■ যৌবন	অক্ষয় মুখোপাধ্যায়	২৭
■ আলেয়া	শ্রীমন্তী মুখার্জী	২৮
■ একটি খরগোশের জন্য	সুজন চক্রবর্তী	২৮
■ ঋতব্রত-র দুটি কবিতা	ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়	২৮
■ "জীবনানন্দ অবশেষে"	সুপ্রিয় ঘটক	২৮
■ জবাব চাই	অনুজ গাঙ্গুলী	২৯
■ আকাঙ্ক্ষা	অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়	২৯
■ রাতের সংসার	সোহিনী সান্যাল	৩০
■ ডুবছে হতাশায় এই স্বদেশ	প্রণয় মজুমদার	৩০
■ হিমসাগরের তীরে	সুমন দত্ত	৩১
■ স্মৃতি	অতনু দে	৩১
■ আমার গ্রামোফোনে	মোনালিসা মজুমদার	৩২
■ চিঠি হাতে মা	ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়	৩২
■ শিক্ষা	তিথি আম্বলী	৩৩
■ এ মৃত্যু কার	প্রীতম ভট্টাচার্য্য	৩৩

কথা সাহিত্য

■ ব্যক্তিগত	শুচিস্মিতা রায়	৩৪
■ স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র	সৌরিশ মুখোপাধ্যায়	৩৭
■ কল্পবিজ্ঞান	কুনাল নাথ	৩৮
VIRTUAL IMAGE : UFM		
■ মানবতার কলঙ্ক গুজরাত	রিলামালা কিস্কু	৪০
■ দংশন	সুশান্ত পাল	৪২
■ ফেরা	রাকেশ মুখোপাধ্যায়	৪৮
■ দাড়ি নিয়ে কেলেঙ্কারি	সিরাজ-উদ্-দৌলা	৫০
■ মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে সমাজের ক্রমবিবর্তন	অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার	৫১
■ 'OF GODS AND SUPER-GODS'	Rajeev Bhattacharjee	53
■ THE ILLEGITIMATE CHILD	Sulogna Chakraborty	54
■ GEOLOGY AT A GLANCE	Avik Manna	54
■ WILL YOU PLEASE TELL ME...WHY...	Soumava Bhattacharya	55
■ THE 'THIRD REICH' AGAIN?	Dibyajyoti Choudhuri	56
■ A SIZZLING PHENOMENON—TENDULKAR	Rana Pratap Singh	57
■ RECIPE FOR SUCCESS A DIFFERENT VISION	Sreemoyee Mukherjee	59
■ WOMAN LABOURFORCE IN THE LIGHT OF MODERNISATION	Shyamasree Dasgupta	61
■ WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT	Bishwaksen Bandopadhyay	63
■ A FEW STOLEN MOMENTS	Saoli Das	64
■ A BROKEN RELATIONSHIP	Dhritishankar Sen	65
■ THE POLITICAL STRUCTURE OF SOCIALIST SOCIETY	Krishnanjan Ghosh Dastidar	67
■ TELL ME WHOM YOU LOVE AND I WILL TELL YOU WHO YOU ARE	Prianko Choudhury	68
■ संघर्ष	Mrithunjoy Gupta	69
■ URDU WRITING		70-73

বৃদ্ধ কবি, আপনাকে

সারা আমেদাবাদ শহর তখন নিশ্চুপ
নিকষ কালো রাতের অন্ধকার ভেদ করে,
গেরুয়া ঝান্ডাধারী লোকগুলো এগিয়ে চললো।
সহসা কাছের কোন মহল্লা থেকে জ্বলে উঠল আগুন —
আগুনে দগ্ধ বত্রিশটি শিশুর কান্না,
মুহূর্তে ভেঙ্গে দিল মধ্যরাত্রির নীরবতা।
ঠিক তখনই, ঠিক তখনই, দেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে
এম. টিভি-র পর্দায় শাহরুখ খানের সঙ্গে,
এক বিরহী প্রেমের গানের দৃশ্যে ভেসে উঠছে
এক বৃদ্ধ কবির মুখ।
মনে পড়ে যায়,
রোম যখন জ্বলছে সম্রাট নিরো তখন
বেহালা বাজাচ্ছেন।
গুজরাট যখন জ্বলছে এক বৃদ্ধ কবি তখন
বেদনা বিধুর প্রেমের গজল লিখছেন।
মনে পড়ে যায়,
নজরুল ইসলামের কবিতা —
"ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?"
গুজরাটের গণহত্যায়, ধ্বংসস্তূপের নীচের কান্নায় —
আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব সেই বৃদ্ধ কবি।
লঙ্কা যুদ্ধে বীর হনুমানের লেজের আগুন
আজও নেভেনি!

● অর্ক রাজপণ্ডিত, Economics (II year)

ক্রিকেটার প্রহসন

সারাবিশ্বের সব থেকে হাস্যকর ব্যাপার,
বল বিকৃতি করেছে নাকি শচীন তেন্ডুলকার।

কৃষ্ণাঙ্গদের উপর সাদা চামড়ার আছে এখানো রাগ,
তারই জেরে বাদ পড়ল বীরেন্দ্র সহবাগ।

ক্রিকেটীয় নোংরামি করতে না পারলে রপ্ত,
সাসপেণ্ড হতে পারে দীপ দাশগুপ্ত।

আর যদি ম্যাচে করে ন্যায্য আবেদন,
পরের ম্যাচেই সাসপেণ্ড স্পিনার হরভজন।

ক্রীড়াঙ্গনে শ্বেতাঙ্গদের না পেলে ভয়ডর,
ম্যাচ ফি কাটা হবে, দেবে শিবসুন্দর।

'নেই দল নিয়ন্ত্রণে' মিথ্যা অভিযোগে,
সতর্ক করা হল সৌরভ দাদাকে।

এ সবের কারিগর ম্যাচ রেফারি ডেনিসের,
ব্যবস্থা করা হোক কেরিয়ার ফিনিসের।

● সৌরভ নন্দী, Zoology (H), 1st year

এক মুঠো জীবন

জীবন তুমি বেঁচে আছ
জীবন তুমি জীবনে আছ।
তোমার জন্যই তো
কত আশা আকাঙ্ক্ষার নীড়
কত কামনা বাসনার ভীড়।
একমুঠো জীবনের জন্যই
কেউ করে ভিক্ষা, কেউ প্রার্থনা
আবার কেউ করে প্রতিবাদ
অসহ্য জ্বালার মধ্যেও তুমি কাম্য।
ফুটপাতে শুয়ে থেকে
বস্তিতে বেড়ে উঠে
ওরা তোমায় চায়,
মৃত্যু পথযাত্রী, দুর্ঘটনায় আহত
যুবকটিও তোমায় চায়,
আত্মহত্যায় জীবন ত্যাগের মুহূর্তেও
আত্মঘাতী তোমায় চায়,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সুখী-দুঃখী উত্তরসুরীর
উন্নতি দর্শনে তোমায় চায়,
মৃত্যু চেয়েও, মৃত্যুর মুহূর্তে
সব মানুষই তোমায় চায়।
একমুঠো জীবনের প্রত্যাশাতেই
কেউ দেয় প্রাণ,
এই জীবনের একাত্মতেই
যত পাওয়া সম্মান।
একমুঠো জীবনই তো শেখায় ভালোবাসতে,
ছোট, বড়, বন্ধু সবাইকে হৃদয়ে টানতে,
সকল বন্ধন ভুলে পরকে আপন করতে।
অদ্ভুত তুমি,
তোমায় দেখা যায় না,
চেনা যায় না,
জানা যায় না,
তবু বিস্মিত করে তোমার অবস্থিতি।
অদ্ভুত তোমার আগমন,
অদ্ভুত তোমার প্রত্যাগমন,
সবুজেই তোমার আসন,
প্রাণেই তোমার অবগাহন।
এক মুঠো জীবন আদর্শ তুমি,
আমিও হতে চাই তুমি,
তাই তুমি আমার কাছেও কাম্য।।

● অর্পিতা চক্রবর্তী, Physics Honours - 1st Year

এক যে ছিল দেশ—

রাজরাজত্বে রাবণ রাজা
প্রধানমন্ত্রী বিভীষণ
যুক্তরাষ্ট্রে বানর সেনা
মুখ্যমন্ত্রী কি ভীষণ।
কোয়ালিশন কোট পরেছে —
টাইতে কলিশন —
মন্ত্রীমশাই কফিন কেনেন,
তাইতে কমিশন।
গুপ্তরাজা সমুদ্র নাম
ঠুকছে সূর্যস্তম্ভ
বেদেই আছে সব বিজ্ঞান
বেদ আমাদের দম্ভ।
পুরুর কাছে হারল শেষে
ডাকু আলেকজান্ডার —
বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে —
'আই ওয়ান্ট মাই থাণ্ডার',
খোলা মানুষ, খোলা মনের
নীতিও তো বুকখোলা —
চোখ বুজিয়ে পদ্য বলেন
রাজা আম্রভোলা।
উক্ত রাজার মুক্ত বাজার
স্বপ্নে মুক্ত প্রাণ
মুখ তো ব্যাজার যুক্ত হাজার
উদারনীতির গান।
সন্ধির তাস, মন্দির চাস
চাস না ক্রিকেট ট্রফি,
ছক্কা মারলে বলবে বোলার
— 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি।'
রাজা বসান মাতৃগর্ভে
ভ্রূণের ওপর ঋণ
পেট্রো আইনে মেট্রো লাইনে
তাক্ ধিনাধিন্ ধিন্
সকাল সকাল সূর্য উঠলে
কেলেঙ্কারির একশেষ
চাঁদ তখনও নাম ভূমিকায়
জায়গাটা তার ব্যাক্‌স্টেজ।

● শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত

তাদের উদ্দেশ্যে

বুকের ভেতর সাশ্রু চোরা স্রোতে
কি পেতে চাইল তারা —
নির্জন পাণ্ডুরতায় বঞ্চনার বাহুডোরে
অজানা কারণে বাঁধল যারা —
একাকীত্বের বন্ধুতায় নির্বান্ধব করে
ঠিক কি দিতে চেয়েছিল তারা?
জানি না, কোন অমোঘ সময়ের
দিশাহীন স্রোতে শ্রান্ত তারা।
বেশী কি পেতে চেয়েছিলাম, যার মূল্যায়িত
পাওনা — শুধু ঘৃণা অভিব্যাক্ত সাড়া —
চাই নি তো বেশী কিছুই তাদের থেকে
উষ্ণ মধুর বন্ধুতা ছাড়া —
ভুলে গিয়েছিলাম স্বার্থের তপ্তকতার যুগে
নিঃস্বার্থ ভাবনা হাসির ছড়া।
তবুও রোজ সকালে যখন সূর্য ওঠে
ভাবি এ যেন স্বার্থহীন আলোকধারা —
প্রতিদিন নতুন করে মৃত হয়
সেই নবীন ভাবনার ধারা।
প্রত্যেক মুহূর্তে ইচ্ছে হয় ভেঙে দিই
এই যান্ত্রিকতার বদ্ধ কারা —
কিন্তু মনের গোপনে তখন চলে
দ্বিধা চিত্ততার ভাঙা গড়া —
যারা আমায় শুনিয়েছিল
স্বার্থ মগ্নতার করুণ অন্তরা —
শপথ নিলাম —
তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবই
সেই সুরের স্নিগ্ধ ধারা।

● অরিন্দম মণ্ডল
ইংরাজী (সাম্মানিক), ২য় বর্ষ

সংকট

সংকট তুমি কে??
তুমি কি মানব বা মহামানব?
নাঃ! তুমি সংকট মানব না; তুমি মানবের সংকট।

নামহীন, গোত্রহীন, অস্তিত্বহীন সংকট।
দৈর্ঘ্যহীন, প্রস্থহীন, আকারহীন, রূপহীন — নিরাকার সংকট।
তবু তোমার বিশ্রী হাসি শোনা যায়।
তোমার ভয়ঙ্কর নিশ্বাস আমাদের ছুটিয়ে মারে,
তোমার অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব সবাই হাড়ে হাড়ে টের পায়।

তোমার নিঃশব্দে চারিদিক থেকে নেমে আসা
দিশাহীন করে তোলে পৃথিবীর উন্নত জীবদের।
কোনো উন্নততম র‍্যাডার তোমার শব্দহীন নেমে আসা বুঝবে না।

তুমি যখন নেমে আসো,
নেমে আসে অশান্তি, হাহাকার
পড়ে অসহায় মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ
যার পরিণতি শুধু ক্ষমাহীন ভুল।
তুমি যখন নেমে আসো
নেমে আসে অশান্তি।
তোমার অদৃশ্য অন্ধকার মেঘচ্ছায়ায়
হারিয়ে যায় শত শত নাটরের বনলতা সেন,
যারা ছিল একদণ্ড শান্তির প্রতীক।

তবু কিছু মানুষের কাছে তুমি যেন এক বোতল মদ।
তোমার জালে জড়িয়ে পড়ে, জাল কেটে বেরিয়ে আসার
নেশায় তারা মশগুল
তারা ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই।
কিন্তু সাধারণের কাছে তুমি জ্বালাতন।
তোমাকে ওরা দেখতে পায় না, বুঝতে পায়।
তাই ওরা দেখতে চায় — তোমার আকৃতি
আবার নিয়ে নেমে এসো সংকট,
দুর্বলের মত লুকিয়ে নয়।
সভ্যতার সংকট, অস্তিত্বের সংকট, মানবতার সংকট
— এক এক নামে নেমে এসো;
এক এক করে।
তোমার এক একটা অস্তিত্বের সাথে আমরা লড়াই করে নেব।

তবু তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য।
তোমার করাল ছায়ায় ইথিওপিয়ায় মানুষ যেমন ধোঁকে
তেমনি ঠাণ্ডা করে দাও মার্কিন দাদার গা-হাত পা।
ভ্রু কোঁচকাতে বাধ্য করো ওদেরও, যারা অন্যদের ভ্রু কুঁচকে
মারতে চায়,
সমস্যাতে সমান করে দাও সবাইকে।
তবু শেষে প্রশ্ন রয়ে যায়,
সংকট তুমি আসলে কে?
তোমার নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করে তোমার প্রাণ আছে।
তবে কি তুমি কোনো প্রাণী?
তুমি কি মানব বা মহামানব??
নাঃ! তুমি সংকট — মানব নও,
তুমি মানবের সংকট।

● শমীক বিন্দু, দ্বিতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান)

শারদীয়া

লাগল দোলা লাগল মনে
লাগল আমার অন্তরে
পাখনা মেলে দূর সুদূরে
যাই ভেসে কোন মন্তরে।
শিউলি ফুলে একটু দুলে
মন মাতানো গন্ধেতে
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
কোন অজানা ছন্দেতে।
নীল আকাশে মন যে ভাসে
শীতল পরশ রোদ্দুরে
পাতায় পাতায় শিশির ঝরায়
মন যে আমার পাগলা রে।
পদ্ম পাতায় আদর জানায়
আবেগ মেদুর রঙ্গেতে
এক ফোঁটা জল একটু খেলা
করছে পাতার সঙ্গেতে।
ঘাড় দুলিয়ে কাশের ফুলে
দু'হাত তাহার জোর করে
বলছে হেসে আকাশ তুমি
রেখো না মুখ ভার করে।
সাজছে ঠাকুর রাত্রি দুপুর
ঘোষাল বাড়ীর আটচালে
পুজোর মেজাজ আসছে ধেয়ে
ছোট্ট ঢাকের বোল তালে।
খুশীর হাওয়া তুলল তুফান
নিয়ে নতুন রঙ্গেতে
জানিস কি ভাই এমন আদর
মিলবে শুধুই বঙ্গেতে।

● শুভ্রাংশু বশিষ্ঠ, বি এ, দ্বিতীয় বর্ষ

আমি সেই মেয়ে

আমার বয়স তখন আঠারো উনিশ।
কলকাতা শহরের একটি
নামকরা সিনেমা হলে দুপুরের শো
ভেঙেছে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অটো, আমি
একটি অটোয় গিয়ে উঠলাম, মধ্য কলকাতায়
প্রতিদিনকার মতো জ্যাম, খানিক থামে খানিক
যায়, ওই থেমে থাকার সময় বাঁ বাহুতে
তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম, দেখি
একটি জ্বলন্ত সিগারেট বারো তেরো
বছরের এক ছেলে ধরে আছে, পরনে লুঙ্গি
গেঞ্জি, আধ খাওয়া জ্বলন্ত
সিগারেট, জ্বলছে আমার বাহু, অসহ্য যন্ত্রণা,
দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে আনি,
অথবা ধরবার জন্য লোকজনের সাহায্য চাইব
অথবা ভাবলাম চিৎকার করি,
কোনটাই আমি করলাম না,
জানি লোকজন জড়ো
করলে সবাই আমাকে দেখবে
আমার শরীরের বাঁক দেখবে
উজ্জ্বলতা দেখবে,
যন্ত্রণা দেখবে
আমার আর্তনাদ দেখবে
আমার ক্রোধ, কান্না
পুড়ে যাওয়া নগ্নবাহু দেখবে
কেউ গায়ে পড়ে কী হয়েছে ব্যাপারটা
জানতে চাইবে, কেউ হয়তো ছেলেটাকে
ধরে এনে চড় কষাবে,
আসলে সকলে
আমাকে দেখবে, উপভোগ করবে,
আমি সেই মেয়ে,
আমিই সেই মেয়ে,
এখনও আমার বাঁ বাহুতে আধ
খাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটের পোড়া
দাগ, এখনো সেই নির্যাতনের চিহ্ন
বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এতে এই
অশিক্ষিত ছেলেটির দোষ দেব না,
কারণ শিক্ষিতরাই যেখানে নির্দোষ
নয়। আমার চোখের সামনে
আমার বান্ধবীর উরুতে চিমটি কেটে
দৌড় দিয়েছে একটি ছেলে, আমার
বোনের ওড়না টেনে নিয়েছে
অচেনা যুবক, ভিড়ের মধ্যে
স্তন ও নিতম্ব স্পর্শ করার
জন্য ওৎ পেতে থাকে একশ একটা
অন্ধকারের হাত। সেই হাতগুলো
কিন্তু সব অশিক্ষিতের নয়
শিক্ষিত হাত,
আমিই সেই মেয়ে
এসবের কোন প্রতিবাদ করি না। বরং
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, এইজন্য যে
এখনো আমার মুখে
অ্যাসিড কেউ ছোড়েনি, আমার দুচোখ
অন্ধ হয়ে যায়নি, এখনো আমাকে
কোন পুরুষ ধর্ষণ করেনি। এখন আমার
বড় সৌভাগ্য আমি বেঁচে আছি।
আমিই সেই মেয়ে,
আসলে আমাদের অপরাধ আমরা
'মেয়েমানুষ' আমাদের শিক্ষা রুচি
মেধা আমাকে মানুষ করতে পারেনি
শুধু মেয়েমানুষ করে রেখেছে।
আমি সেই মেয়ে।

• কৃষ্ণেন্দু ঢ্যাং
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

মুখোশ

রাত্রি হলেই রাতের আকাশ
তারায় তারায় ভরে.....
তারায় তারায় খসে পড়ে.....
রঙ বে রঙের পোশাক .....
মুহূর্তে পাল্টে যায় শরীর
রঙ বে রঙের তুলি।

রাত্রি হলেই ঝিঝির ডাকে.....
চেনা সুর, বেসুর হয়ে পড়ে
রাত্রি হলেই সোজা পথ
এঁকে বেঁকে অন্ধকারে মিশে.....
রাত্রি হলেই গন্ধ বদল হয়,
রাত্রি হলেই শব্দ বদল হয়
রাত্রি হলেই সব বদল হয়,

রাত্রি হলেই চেনা মুখ.....
অচেনা হয়ে পড়ে।।

• সুরজিৎ দে
রসায়ন বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

না দেখা পুজো

"পূজনীয়া
মা,
আশা করি তুমি বাবা বোন নিশ্চয়ই ভালো আছো
দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল
গত পূজোয় ঘর ছেড়েছিলাম।
মা,
আকাশে নীলরঙের মেঘ দেখা দিয়েছে?
আমার এখানে নীল আকাশ দেখা যায় না —
সারাক্ষণ ধোঁয়া আর আগুন,
আর ঐ যে আমাদের বাড়ীর পিছনের জমিটায়;
কাশ ফুলগুলো নিশ্চয়ই এতো দিনে বড় হয়ে গেছে?
বোনের স্কুলে মনে হয় ছুটি পড়ে গেছে,
তাই না?
মা,
আমাদের গ্রামের চৌধুরীদের পুজোটা হবে তো?
আমার তো যাওয়া থাকা কোনটাই হবে না
শুধু অষ্টমীর দিন আমার হয়ে
তুমি দুটো ফুল দিও মায়ের পায়ে:
আমি কেমন আছি?
ভালোই আছ ....;
জান মা, এখানে শুধুই পাহাড়, শুধুই আগুন
শুধুই রক্ত আর শুধুই লাশ।
মা,
তোমায় একটা মজার কথা শোনাই
আমাদের এখানে দুর্গা মায়ের অকালবোধন হয়
অবাক হলে তো! আসলে এখনে আমরা রোজ
অসুর নিধনের দৃশ্য দেখতে পাই —
মায়ের ত্রিনয়নের মতো ঝলসে ওঠে আগুন
শঙ্খের ন্যায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে এ-কে-ফর্টি সেভেন
ঢাকের ন্যায় গর্জে ওঠে বোমা
আর আমাদের চোখের সামনে একটা সজীব প্রাণ
পড়ে থাকে লাশ হয়ে।
জান মা, সেদিন পাহাড়ের গায়ে একটা গোলাপী রঙের
ঘাস ফুল দেখে;
আমাদের বাড়ীর স্থলপদ্মের গাছটার কথা
মনে পড়ে গেল।
মা,
নিশ্চয়ই প্রত্যেকবারের মত অনেক ফুল ফুটেছে?
দেখ গাছটার গোড়ায় পোকা হয়েছিল গতবার।
কটা টাকা পাঠালাম —
ভাইফোঁটার দিন বোনকে একটা জামা কিনে দিও।
জান মা আমাদের টেনটে একটা দুর্গামায়ের ছবি আছে
রোজ সকালে ছবিটার দিকে তাকাই
আর ছোটবেলায় তোমার কাছে শোনা
দুর্গা মায়ের মহিষাসুর বধের গল্প মনে পড়ে যায়
আচ্ছা মা, আমাদের এই হিংস্র পাশবিক সমাজে
আর একবার কী মা দুর্গা আবির্ভূতা হতে পারবে না?
ধ্বংস করতে পারেন না
এই মনুষ্যত্বহীন মানুষগুলোকে
যারা ধর্মান্ধতার পতাকায় জাত্যাভিমানের প্রতীক এঁকে
ক্যানসারের কীটের ন্যায় কুরে কুরে খাচ্ছে
আমার দেশকে।
সাইরেন বাজছে, সময় নেই
আমায় আবার সামিল হতে হবে
রক্ত আর আগুনের খেলায়
আজ এখানেই চিঠি শেষ করলাম
আমার প্রণাম নিও
চিন্তা কর না বিজয়ায় চিঠি লিখব
ইতি
তোমার ....."
এরপর তাকে আর কোনদিন চিঠি লিখতে হয়নি
বিজয়ার দিন সে নিজে এসেছিল
তার মায়ের কাছে
তেরঙ্গায় ঢাকা কাঠের কফিনে মোড়ক হয়ে।।

● **শাশ্বতী মান্না**
কলা বিভাগ - দ্বিতীয় বর্ষ

ভুলিনি তোমায়

সেই পূর্ণিমার রাতে, চাঁদের আলোয়,
আমি দেখেছিলেম তোমায় প্রিয়ে।
দেখেছিলাম তোমায় প্রথম বার,
সেই পূর্ণিমার রাত আজ এসেছে এবার।।

তুমি সেই আলোকিত রজনীতে
প্রথম এসেছিলে আমার কাছে,
তোমার সেই মিষ্টি হাসি আর কথাগুলি,
রয়ে গেছে হৃদয়ে শুধুই স্মৃতি হয়ে।।

কত কাছে ছিলাম আমি তোমার,
কিন্তু তাও ছিলে তুমি কত দূরে।
কত বার চেষ্টা করেও বলতে পারিনি,
যে এই মনটা আমার চায়ে শুধুই তোমাকে।।

ইশারা করেছিলাম আমি তোমায়,
করতে এসেছিলে তুমি আমার কাছে।
আমার সঙ্গে বসে কত কথা বলেছিলে,
আর কথা দিয়েছিলে দেখা করবে পরের শনিবারে।

কিন্তু সে দিনের পর আর দেখা নেই তোমার
নেই কোন খবর, হয়েছি বড় নিরুপায়।।
হয়তো তুমি আমায় ভুলে গেছো প্রিয়ে,
কিন্তু আমি আজও ভুলিনি সেই রাত,
আমি ভুলিনি তোমায়।।

● সৌমাভ ভট্টাচার্য্য
অর্থনীতি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

স্বপ্ন দেখি

সেইদিন আমি লজ্জামুক্ত হব
(যেদিন) সবার ঘরে মিলবে ভাতের গন্ধ
সেইদিন আমি বুক ভরে ঘ্রাণ নেব।
(যেদিন) মানুষবলির যন্ত্রণা হবে বন্ধ।

সেইদিন আমি লজ্জামুক্ত হব
নিজেকে দেখে করবো না ঘৃণা আর
সেইদিন আবার বুক ভরে নেব ঘ্রাণ
জীবনকে ভালবাসবো বারেবার

● নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য

যৌবন

হয়ত মনের গহনে হাসা কাঁদা খেলা করে যায়,
খেলা করে যায়
কত স্বপ্ন, হিংসে, দ্বেষ
চিরঞ্জীব আবর্তনের সাথে।
পিপাসার্ত হৃদয় ক্লেশময় পৃথিবীতে
আলো খুঁজে পেতে চায়,
অথবা অশ্বত্থের তলে বোবা ভিখারীর মতো
চোখের ভাষায় শুধু ভেসে যায় ডাক।
তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো
অহংকার পাপাচার সাথে নিয়ে
স্বর্গের পথ খুঁজে পেতে চায়।
খুঁজে নিতে চায় আপনার মতো
ক্রন্দনে স্বপনের গান,
অথবা পৃথিবীর মতো
মায়াময় জগতেতে
খুঁজে নিয়ে চায় শুধু প্রাণ।
এখানেও মৃত্যু আসে
আলোদের মাঝে কিছু ছায়া এনে দিতে,
গহিনের বুকে শুধু কালি ঢেলে দিতে,
তবু জীবন, জীবনের প্রাত্যহিকী মেনে
বিদ্রোহের ডাক তুলে যায়।
অসম্ভব দলিত হয় সম্ভবের কাছে,
এক শাশ্বত হিসেবের জেরে
মাটি, পথ, জলকণা গেয়ে যায় গান,
প্রকৃতির বুকে রাগিণীরা ভীড় করে আসে
এক ধরনের ডালি হাতে।
এখানেও ধূসরতা এসে
আকাশেতে আল্পনা কাটে
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে।
এখানে শুধু রূপকথা কথা বলে যায়
শান্ত স্বপনের তরী বেয়ে।
রক্তের উগ্র তেজ
কখনও সবকিছু রঙীন করে দেয়
রক্তিমের নেশায়,
কখনও পাবকের মতো
বর্জিতকে নিশ্চিহ্ন করে
সভ্যতাকে টেনে নিয়ে যায়।
পৃথিবীতে তবু মেলে না স্বীকৃতি—
এরা পুরাতন শহীদের মতো
কবরের তলে শুধু নিয়ে যায় ফুল।
তবুও প্রকৃতি এদের হাতে
তুলে দেয় যাবতীয় তৃপ্তির ডালি;
সাধ্যমত গেয়ে চলে গান।
এদের করগ্রাসে ভবিষ্যতে অতীতের ছায়াপাত ঘটে,
এরা আপনার হৃদয়েতে রক্ত লেখায়
মানবিক স্ফূরণের ইতিকথা লেখে।

● অক্ষয় মুখোপাধ্যায়
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

আলেয়া

প্রথম বর্ষ, কলা বিভাগ (সোসিওলজি)

মানুষ—কখনো দুখী, কখনো সুখী।
বাড়ি—কখনো সভ্যতার ঐতিহ্য, কখনো পুরোনো অসহ্য।
রাস্তা—কখনো আঁধারে পরিপূর্ণ, কখনো ভাঙ্গাচোরা জরাজীর্ণ।
গাছ—কখনো চির উন্নতশির, কখনো চির মরণশীল; স্থির।
আকাশ—কখনো যুদ্ধলীলায় রক্তিম পৈশাচিক ,
কখনো ধীর, নীল, ঐশ্বরিক।
জীবন—কখনো আছো নেই, কখনো নির্মম একঘেয়ে সে—ই।
মন—দিগভ্রান্ত একা একা তাই;
আমি পরশপাথর খুঁজে বেড়াই,

• শ্রীমন্তী মুখার্জী

একটি খরগোশের জন্য

হৃদয় খুলে ধরি তোমার সামনে
সমুদ্রমন্থনের জন্য।
ছোট্ট খরগোশ এসে বলে
'আমি পাতালের জন্য'।

• সুজন চক্রবর্তী
প্রথম বর্ষ (ইংরাজী)

ঋতব্রতর দুটি কবিতা

সুখের কথা আর বলবো না—
ঘর্মাক্ত ধোঁয়া আর মুষ্টিবদ্ধ হাতে
সুখেরা ঘুমোয় না,
ফরাসী দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও
সুগন্ধীর কারখানাতেও
ঘর্মাক্ত ধোঁয়া আর মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো
আড়মোড়া ভাঙছে।

কলমী শাকের গন্ধ তোমার বড় ভাল লাগত
তাই অন্ধকার
পুকুরপাড়ে—
একাকী, নিঃসঙ্গ, অসাড়।
আকাশে আলতা ঢালব ভেবেও
অন্ধকারে নামতা পড়ি।

• ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র (১৯৯৬-২০০১)

"জীবনানন্দ অবশেষে"

রবীন্দ্রের সদাসিক্ত মনে
নিত্য যার আনাগোনা—
ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম
ঢাকাই বুঁটির শাড়ী পরনে
কপালে সিন্দুর-বিন্দু, কানে ঝুমকো সোনা
কবির ভিজিটার্স বুকে লেখা নেই
অস্পষ্ট সে-নারীর নাম!

কালিদাসের ভুর্জপত্রে লেখা
সরস্বতী নদীর বালিকা—
নাম মালবিকা,
কুড়ি বছর পরে শিশির ভেজা ঘাসে আবার পেয়েছিলে
তার দেখা;
বহু আকাঙ্ক্ষিত কোলকাতা আজ পরিণত কল্লোলিনী
তিলোত্তমায়—
নির্জন ঘরে যুবকের ঠোঁটে পুড়ে যাচ্ছে সময়।
ধূসর পাণ্ডুলিপি পড়েছে তাই ঢাকা
বেলা-অবেলা পেরিয়ে আসা কাল বেলায়।

ধানসিঁড়ি নদীপারে জীবনানন্দ শেষে
বিম্বিসার-অশোকের জগতের পারে
শ্রাবস্তী কি বিদিশার অন্ধকার ঘেঁষে
দারুচিনির দেশে
পেয়ে যান নায়িকার নাম?
বনলতা সেন তাই তোমাকে বলেন—
এতোদিন কোথায় ছিলেন?

প্রশ্ন করেছি রুদ্ধদ্বারে বারে বারে
একান্ত সাক্ষাৎকারে—
তুমি আমার হৃদয় সূর্যভোর; জেনেছি তোমার কবিতা
সে আমার স্বাধীনতা।
বুকের কৃষ্ণ আঁচল ঢেকে দিনের সূর্য প্রতিদিন প্রৌঢ় হয়
ধূসর জীবনানন্দ একদিন অবশেষে জানি,
রূপসী বাংলার নদী-মাঠ ভালবেসে
আবার আসবে ফিরে
গাঙুড়ে জলে ভেজা ভালোবাসার এদেশে।

• সুপ্রিয় ঘটক
বি এ (প্রথম বর্ষ)

জবাব চাই

বড় রাস্তার ধারে রুটের বাসটা থমকে আছে,
নিরুপায় ড্রাইভার—
স্টিয়ারিং-এর উপর ভর দিয়ে সময় গুনছে,
অসহায় কনডাক্টর —
ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ধুমপান করছে,
যা ভাবা গেছিল — তা নয় —
নয় কোন যান্ত্রিক গোলযোগ,
না-কোন জ্যাম জট,
মানছি না, মানবো না —
চলছে — চলবে-এর বিশাল কলেবর
জোর আওয়াজ।
বাসে যাত্রীদের ফিসফাস নিষ্ফল গর্জন,
কারও হাজিরার খাতায় লাল দাগ পড়বে —
যা নিজের জন্যে কোনদিনও হয় নি,
কারও কার্ড পাঞ্চ হবে না সময় মতো?
কাটা বেতন বা ছুটি,
কারও জুটবে 'বস'-এর ধমক,
আরও কত কিছু।
হাসপাতালে বা নার্সিং হোম ভর্তি
নিজের আপনজনের খাবারটা পৌঁছানো যাবে না —
এমনকি জীবনদায়ী ওষুধ বা ইঞ্জেক্শনটাও।
বহু তপস্যার ফল চাকরীর ইন্টারভিউ —
পৌঁছানো যাবে না — আশা শেষ।
তবুও তার মধ্যে শুনতে হয় —
চলছে, চলবে, মানছি না মানবো না,
জবাব চাই - জবাব দাও
জবাব তোমায় দিতেই হবে।

• অনুজ গাঙ্গুলী

আকাঙ্ক্ষা

আমি জানি, আবার বসন্ত আসবে,
আবার গাছে গাছে লাগবে ফাগের ছোঁয়া,
সেই স্পর্শে স্নিগ্ধ হবে প্রাণ
আমি জানি, তবেই আসবে ফিরে সমাজের সম্মান।।

আমি জানি, এই ধূসর ঋতু যাবে চলে,
কেটে যাবে দূষণের মেঘ,
শেষ হবে হানাহানির অন্ধকার,
আমি জানি, আর হবেনা কোনহ হিরোশিমা
বা কোন ১১ই সেপ্টেম্বর।।

আমি জানি, একদিন সমস্ত পৃথিবীবাসী হবে সাক্ষর,
ঘটবে উচ্চনিচের এক নতুন মানববন্ধন,
অস্ত হবে দুর্ভিক্ষের আর্ত হাহাকার,
ঘুচবে দারিদ্র্যের অন্ধকার —
আমি ভীষণ রকম স্বপ্ন দেখি সেই দিনটার।।

আমি জানি, সেই দিনের নেই বেশী দেরী,
সে দিন আসবে খুব শীঘ্র,
খুব তাড়াতাড়ি।।

• অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
1st year, Zoology (Hons.)

রাতের সংসার

পাতার আড়ালে উঁকি মারছে পূর্ণিমার চাঁদ
বাহিরে মৃদু বাতাস বইছে
প্রকৃতি আনন্দিত আজকের সন্ধ্যায়
শুধু আমার ঘরে বিষণ্ণতার ধোঁয়া,
শূন্যঘর আগলে বসে আছি একা
বিছানায় নেই আমার প্রেমিকা
স্মৃতিতে তার আনাগোনা
সবকিছু কুয়াশায় ঢাকা।

মনে পড়ে সেদিনের কথা
প্রথম যেদিন দেখেছিলাম তাকে
পরনে হলুদ শাড়ি
বড় বড় চোখ মেলে দেখেছিল আমাকে
প্রতিদিন দাঁড়াতাম আমি
আর আসা-যাওয়ার পথে
রাতে স্বপ্নে আসত সে
জড়িয়ে ধরত আমায় বুকে
তার শরীরের আবেশে ঘুমোতাম আমি
সকালে ঘুম ভাঙত পচা চিঙড়ির গন্ধে
বাসনের আওয়াজে,
আবার গিয়ে দাঁড়াতাম তার
আসা-যাওয়ার পথে,
প্রতিদিন স্বপ্নে আসত সে
আমাদের রাতের সংসার
রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যেত।
তবু কেন জানিনা বড় আশা ছিল
দিনের আলোয় সে আসবে
আমার খোলার চালের বাড়ীতে
প্রতিদিন দেখতাম তাকে
হঠাৎ দু-দিন এল না সে
তিনদিনের সকালেও দেখা পেলাম না তার
রাতে দাঁড়িয়ে দেখি —
লালচেলি পরে
সে যাচ্ছে অন্যের সংসারে
আমার খোলার চালে আসা হলো না তার
শূন্য ঘরে বসে আছি আমি
শুষ্ক চোখে ভাসে
আমাদের রাতের সংসার।।

• সোহিনী সান্যাল

ডুবছে হতাশায়, এই স্বদেশ

এক বুক খিদে নিয়ে
ভাতের থালায়
বসলে খিদে উধাও হয়ে যায়।
এক বুক তৃষ্ণা মেটাবার আশায়
গ্লাসভর্তি জল হাতে নিলে
নিমেষে তৃষ্ণা উধাও হয়ে যায়।
পড়তে বসলে পড়বার ইচ্ছাটা
কোথায় যেন চলে যায়।
কোন সুন্দর মুখ দেখলে তার সমস্ত
সৌন্দর্য দু'চোখ থেকে
কেন জানিনা উধাও হয়ে যায়।
এক গাল হাসি দেখে
আলাপ জমাতে ইচ্ছা করলে
বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে।
এক বুক ইচ্ছা নিয়ে
কোনো কাজে মনোনিবেশ করলে
ইচ্ছাটা নিমেষেই অদৃশ্য হয়ে যায়।
এক বুক আশা নিয়ে
স্বপ্ন গড়তে গেলে
স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় ডুকরে উঠি।

• প্রণয় মজুমদার
১ম বর্ষ, কলা বিভাগ

হিমসাগরের তীরে

জীবনের জটিল ছায়াযুদ্ধে
লড়তে লড়তে ক্লান্ত আমি যখন আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লাম,
তখন হিমসাগরের
তীরে দাঁড়িয়ে মুক্ত আকাশে খেলা করতে চাইলো
আমার মন, আমার শরীর।
ছায়াযুদ্ধের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে
ইচ্ছা হ'ল ছুটে চলে যাই দূরে বহু দূরে
যেখানে আমার অঙ্কশায়িনী হবে সবুজ প্রকৃতি।
ছুটে যেতে ইচ্ছা করলো সেই নদীর পাড়ে
যেখানে হয়ত আজও আমার জন্য বসে আছে
কোন এক রাধা, বিস্রস্ত বসনে,
কিংবা ছুটে যেতে ইচ্ছা করলো সেই
কালরাত্রির জঙ্গলে —
যেখানে 'ঘাই হরিণীর যোনির গন্ধ' তীব্র মধুরভাবে
মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে —
অঙ্কশায়িনীর ভালবাসার মতন।
ইচ্ছা হ'ল
রোম্যান্টিক হ'য়ে উঠে বনলতা সেনের পর্বত গিরিপথ ঘুরে
সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের
মিলনস্থলে চলে যেতে;
যেখানে হয়ত ছায়াযুদ্ধ নেই, নেই তার জটিলতা।
আছে শুধু —
প্রেম, কাম আর ভালোবাসা।
যেখানে আছে শুধু
প্রকৃতির সঙ্গম কথা,
সবুজের আহ্বান,
নেই কোন নাগরিক যান্ত্রিকতা।
এখন তাই যেতে চাই সেই হিমসাগরের তীরে —
যেখানে খেলা করে আমার শরীর নীল আকাশ নিয়ে,
— শুধু নীল আকাশ নিয়ে।

● সুমন দত্ত
বি এ (প্রথম বর্ষ)
বাংলা (সাম্মানিক)

স্মৃতি

যেদিন ঐ দূরের কৃষ্ণচূড়ার
সর্বাঙ্গ সজ্জিত পাতা ফুলেরা
তার দেহ থেকে একে একে খসে পড়বে
নিঃশব্দে!
সেদিন তুমি স্মৃতি হয়ে যাবে।

যেদিন "একবুক আকাশ"-এর পাখীর
দল তাদের ডানায় ঢেকে ফেলবে আকাশ,
তীব্র আর্তনাদে!
সেদিন তুমি স্মৃতি হয়ে যাবে!

কেটে যাবে অনেক মুহূর্ত, কাটবে ছন্দ
স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে থাকবে
একের পর এক সিকুয়েন্স —
লাইট, সাউণ্ড, ক্যামেরা, অ্যাকশ্‌ন!
তীব্র নীল আলোর ঝলকানিতে চোখ
ধাঁধিয়ে যাবে তোমার।
নিস্তব্ধতার নিস্তব্ধতায় ঠিক তখনই
বারে বারে ফিরে আসবে স্মৃতি।
শুধুই স্মৃতি;

● অতনু দে
বিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

আমার গ্রামাফোনে

অন্ধকার আকাশ,
আকাশে অজস্র তারা মিট্‌মিট্ ক'রছে,
নীচে আমি — একাকী। নিঃসঙ্গতা উপভোগ
ক'রছি মেনুহিনের বেহালার সুরে।
কোথায় যেন সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়ে
ঘরের বধূ শঙ্খধ্বনি ক'রে উঠলো, —
তাল মিলিয়ে সামনের ধানক্ষেতের
পাশে কোন এক গাছে ব'সে থাকা প্যাঁচার বিষণ্ণ সুর
শোনা যায়, — স্পষ্টভাবেই
অস্পষ্ট অশুভ কোন এক ইঙ্গিতে।
ওপাশের কোন এক গ্রামে বোধহয় কারুর বাড়ীতে
কেউ মারা গেল, — এসব বোঝা যায়
অকস্মাৎ উচ্চস্বরে মড়া কান্না শুনে।
এসবের মাঝেই বেজে চলে আমার
গ্রামাফোনে — মেনুহিনের বেহালার রেকর্ড।
অন্ধকার আকাশ,
আকাশে অজস্র তারা মিট্‌মিট্ করছে,
নীচে আমি — একাকী। নিঃসঙ্গতা উপভোগ
ক'রছি।
আস্তে আস্তে রাত বাড়ে,
সাঁঝের বাতির সল্‌তে শেষ হয়,
আশেপাশের গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ে,
আমি জেগে ব'সে থাকি
গ্রামাফোনে রেকর্ড বাজিয়ে। — সাথী
রাতজাগা প্যাঁচা।
রাতের রঙ পাল্টায়,
গন্ধ পাল্টায়, — গাছেরা কথা ব'লতে শুরু করে।
রাতের কুয়াশা
তার চাদরের এক একটা ভাঁজে
গ্রামগুলোকে জড়িয়ে নেয়, —
ধানক্ষেত পেরিয়ে আমার মনে এনে দেয়
স্তরের পরে স্তর জমার মাদকতা।
আমার গ্রামোফোনটা বেজেই চলে।
দূর থেকে এগিয়ে আসা কুয়াশার চাদরের আড়ালে
অনামা কোন এক কিশোরীকে যেন নাচ্‌তে দেখি, —
এলোকেশী সে কন্যা। চোখে তার আলেয়ার
আগুন। পাশে দ্যোতক, প্যাঁচার কর্কশ ডাক।
রাতের হিমেল হাওয়ায় ধানচারাগুলির ঘষঘষানির
শব্দটাকে ঐ এলোকেশী কন্যারই নূপুরের শিঞ্জন বলে
মনে হয়।
আস্তে আস্তে রাতের আকাশ ফিকে হয়,
সারারাতের দ্যোতনা বাহক কর্কশ সুরস্রষ্টা
প্যাঁচার চোখে ঘুম আসে।
ভোরের পাখিদের ঘুমভাঙার সময় আসে,
এলোকেশী কন্যা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে,
গাছেরা সব চুপ ক'রে যায়,
ঘাসের ধারে শিশির জমে,
আরেকটা দিন শুরুর জানবোনা শুরু হয়।
আমার গ্রামোফোনে
মেনুহিনের বেহালার রেকর্ড বেজেই চলে।

• মোনালিসা মজুমদার
বি এ (প্রথম বর্ষ), বাংলা (সাম্মানিক)

চিঠি হাতে, মা

চিঠি হাতে অপেক্ষা কর, মা
আধখোলা লোহার গেটে দাঁড়িয়ে
ভেজা চোখ বুলিয়ে দাও
নীলখামের উড়োজাহাজ আঁকা স্ট্যাম্পে

নিষ্ফলা দেবদারুটার মাথায় নতুন বর্ষা
এসে গেল।
বৃষ্টি এল না ছায়াঘেরা উঠোনে তোমার

ফাঁপা মেঘেদের বুকে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে
বেঁচে আছো, নদী!
যার খিলানে খিলানে মৃত বকের ফসিল আজও
তুমি চিনে নিতে পারো
ওই —
দু'পারে আদিম সভ্যতার মড়ক।
আগাছা বাগান। হলুদ প্রজাপতির
ডানার ছাপ রেখে গেছে
এ পাতা ও পাতায়

রাত্রি নেমে এল দেবদারুর মাথায়
আর কে ফিরবে,
বলো! কার অপেক্ষায়
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ধরে রাখো
উদ্বৃত্ত সময়ের বুকে?

লোহার গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে
এ দেশের ম্যাপটাও ঢাকা প'ড়ে যায়

• ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়
বিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

শিক্ষা

শিক্ষা — একটা এমন বীজ, যাকে
রোপণ করতে হয় মানুষের
মনের ভিতরের নরম মাটিতে।
নান্দনিকতা আর সত্যের
বাতাবরণে যখন সেই বীজ,
ক্রমে চারাগাছ থেকে
মহীরুহে পরিণত হয়, তখনই
ফুলে - ফলে আর শীতল
ছায়ায় সমৃদ্ধ সেই শিক্ষাতরু,
আমারে ভরিয়ে দেয় —
মননে, ধনে, সম্মানে আর
আধ্যাত্মিকতায়।

শিক্ষা — একটা আলোর বিন্দু,
যেন জানালা - বন্ধ করা অন্ধকারে —
আচ্ছন্ন কোনো ঘরের, অতিক্ষুদ্র
কোনো ছিদ্র দিয়ে এসে পড়া
সূর্যের আলোর রশ্মি।
অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের
সংকীর্ণ গণ্ডীকে ভেঙে
দিয়ে মনের ভিতরের গুমোট
অন্ধকারে সঞ্চার করে
শীতল দমকা বাতাস।

সর্বোপরি, শিক্ষা একটা মহামন্ত্র,
প্রকৃতের মাধ্যমে প্রকৃতির
অনুসন্ধানের নামই শিক্ষা।
দশখানা বই পড়ে, ডিগ্রী
নিয়েও যা লাভ করা যায়
না — আবার সঠিক
বিচার ও বিশ্লেষণ একজন
ইতরও হয়ে ওঠেন শিক্ষিত।
শিক্ষা — এক মহাস্ত্র — যা
দিয়ে লড়াই করা যায়
পৃথিবীর সকল অজ্ঞানতা,
কুসংস্কার আর অযৌক্তিকতার
সঙ্গে। তাই সর্বশক্তিমানের
কাছে প্রার্থনা — শিক্ষা আর
স্বাধীনতার আলোকে
সমুজ্জ্বল হোক এই পৃথিবী
শিক্ষা হোক সকলের মৌলিক অধিকার।

• তিথি আম্বলি
বিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

এ মৃত্যু কার

এখানে সমস্ত দিন
অনন্ত রাত্রির বুকে ঢাকা
বিষাক্ত বাতাসে প্রতিদিন
রিক্ত, ভালোবাসাহীন
মৃতের মতোন পড়ে থাকা।

এতোদিন কাছে কাছে ছিলো যত ভালোবাসা,
এতোদিন গায়ে ছুঁয়ে ছিলো যত সুখ-আশা,
সবকিছু পচে-গলে গিয়ে
আজ, শুধু কঙ্কাল-হাড়
পড়ে আছে, মৃতের মতোন!
এ মৃত্যু কার?

চারিদিকে শকুনের দল
তরতাজা মাংসের আশায়।
শিয়ালও এসেছিলো কতোগুলো
গরম রক্তের নেশায়
নিরাশ হয়েছে তারা সব!
রক্তহীন ফ্যাকাসে শরীর
চামড়া, মাংস পচে-গলে;
কণ্ঠে হতাশা শকুনির।
বাকি আছে শুধু দুটো চোখ
গভীর জিজ্ঞাসা কোলে তার —
অন্ধকারে বিষাক্ত বাতাসে
পচা-গলা এ মৃত্যু কার?

• প্রীতম ভট্টাচার্য
অর্থনীতি (অনার্স), প্রথম বর্ষ

ব্যক্তিগত

হ্যালো, ভাগ্যিস তুই ফোনটা ধরলি, না হলে ... নাহলে তোর বাড়িতে আবার একটা ব্ল্যাঙ্ক কল, অবশ্য মাঝে মাঝে তুই ফোন ধরলেও ব্ল্যাঙ্ক কল করি, কী বলছিস? কখন? যখন তোর সাথে কোন কেজো কথা থাকে না, অথচ তোর সাথে কথা বলার ইচ্ছেটা থাকে প্রবলভাবে।

— আচ্ছা আচ্ছা, শোন, তুই মন্দ্রাক্রান্তা সেনের কবিতা পড়িস? তোর গলাটা কিন্তু বেশ, অন্ততঃ তোর গলাটা আমার বেশ লাগে।

— আচ্ছা শোন, তোর বাবা রাগ করবে নাতো? না মানে এই যে—তুই মানে—এই যে আমি এতক্ষণ ফোনে কথা বলছি।

— আচ্ছা তোকে আমি বিরক্ত করছি না তো, কি বললি বিরক্ত করছি? আচ্ছা তুই এইরকম রুক্ষভাবে কথা বলিস কেন? একটু ভালো করে কথা বলতে পারিস না। সব সময় আমার সাথে ঝগড়া করিস!

— না প্লিজ, শোন, এসব কথা কলেজে,

— না, কলেজে, তুই বড্ড ব্যস্ত, অথবা ব্যস্ততার ভান করিস। আচ্ছা, তোর কি মনে হয় বন্ধুত্ব বা ভাললাগায় দুজনকে সমবয়সী হতেই হবে।

— দ্যাখ, আমায় বলতে দে — আর যদি কখনো বলতে না পারি, সামনাসামনি কথা বলতে আমার খুব প্রবলেম হয়, এত লোক, এত ভীড়, তারপর ধর, তোর আমার কথা পছন্দ হল না।

— তোর ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন-এ তা ফুটে উঠল, ব্যস, জানিসই বেশি ভাবা আমার স্বভাব।

— আজ তোকে আমার অনেক অনেক কথা বলার আছে। হোক না আজ একটু পড়ার সময় নষ্ট। প্লিজ ভাবছিস নিশ্চয়ই এ কেমন বেয়াড়া আব্দার, তা হোক। যদি আর কখনো বলে উঠতে না পারি, আর কি কখনো কবে, এমন সন্ধ্যা হবে, তাই ... যা হোক বাজে বকছি।

— কী? বাবা ফোন করবে?

— প্লিজ, প্লিজ, রেখে দিস না, অনেক কিছু বলার আছে রে। কাল ভোরেই ট্রেন। আজ না হয় একটু বকা খেলি। ফোন রাখবি না। আগের দিন ঠকাস করে ফোনটা রেখে দিলি অসভ্যের মতো, আমি তখনো ফোনটা ধরেছিলাম।

— জানিস, তাতাই, ... হ্যালো ... হ্যালো।

হ্যালো ... আওয়াজটা কাপসা লাগছে, পাশে কে? বাবা? মা? আচ্ছা, তোকে কিছু বলতে হবে না। শোন খালি।

যে কদিন তোর সাথে আমার নিয়মিত দেখা হয়েছে, রোজ রোজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ... আর দশজনের মধ্যে, কোনও দিনও আমার বাড়িতে, কখনো কোনওদিনও বা কলেজেই নিবিড় অনুশীলনে ... তার আগে পর্যন্ত আমি তোকে পছন্দ করতাম না মানে করতাম কি করতাম না ভেবে দেখিনি ঠিকমতো।

— কী? অনেকক্ষণ কথা বলছি। আচ্ছা বেশ — তাড়াতাড়ি শেষ করছি — তবু জানিনা কী করে — তোর গুনগুন করে গাওয়া গান — 'যেদিন জীবনে তুমি প্রথম দিলে গো দেখা — সেদিন বুঝিনি আমি আবার হব যে একা — মনে পড়িয়ে দিতো, ভীষণ ছুঁয়ে যেতো আমার হারিয়ে যাওয়া — হঠাৎই ছিঁড়ে যাওয়া একটা সম্পর্কের সঙ্গীকে। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম।

— একদিন ফোনেই তোকে বলেছিলাম তার কথা মনে আছে তোর?

— দাঁড়া হোল্ড কর, একটু, তেষ্টা পেয়েছে, জল খাই, কী?

টি.ভি.-র সাউন্ডটা কমা, শুনতে পাচ্ছি না, কী বলছিস? ১৫ মিনিট হয়ে গেছে। হোক গে।

— যা হোক শোন, সেদিন আমি সত্যিই বুঝিনি — তোর একটু কথাতেই কেন আমার খারাপ লাগে — বুঝিনি এক্সপেকটেশনটা কখন বেড়ে গেছে — সেদিন সন্ধে হয়ে এসেছিল, আমার জন্মদিন। আচ্ছা তুই কি সত্যিই আমায় এ্যাভয়েড করিস, ধুৎ জানিনা। সেদিন তুই আমায় জানিয়েছিলিস, আকারে ইঙ্গিতে, যে তোর কাছে সবাই যা আমিও তাই — আসলে মাঝে মাঝে অনেক না পাওয়ার বেদনা মনটাকে বড্ড নাড়িয়ে দিয়ে যায়। না শোন, বাধা দিস না, আজ আমায় বলতে দে — আমার সেই সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু — আমার স্বপ্নে যে আমার কমরেড, তাঁর একটা ডায়েরি আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল, এমন একটা সময়ে যখন তার ডায়েরী পড়ে আমার মনে ঝড় তোলা প্রশ্নগুলো সামাল দেওয়ার জন্যে সে কোথাও নেই, পৃথিবীর কোনখানেই। তার ডায়েরীর প্রতি পাতাতেই ছিল অন্য নারীর উপস্থিতি, অদ্ভুত প্যাসন সে সম্পর্কে, জানি না রে, বুঝিনি সম্পর্কটাকে হজম করে

উঠতে পারিনি ঠিক। সম্পর্কে তারাও ছিল কলেজে সিনিয়র-জুনিয়র — রাজনীতিতে অভিন্ন মতে বিশ্বাসী। কীরে শুনছিস? শুনলে হয়তো অবাক হবি, দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে সম্বোধন করা হয়েছিল দুজনের সন্তান হিসাবে। অদ্ভুত কনসেপ্ট, না? পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ছিল। যার ডায়েরী পড়ছি — তার সাথে আমার সময় কাটাবার মুহূর্তগুলো — বোর হচ্ছিস? জানিস একদিন দেশপ্রিয় পার্কের ক্রসিং-এ আমরা রাস্তা পার হচ্ছি — আকাশ বড় ভারী, তড়িঘড়ি বৃষ্টি, ঝির ঝিরিয়ে নামছে — রাস্তা আমরা পার হতে পারছি না — কারণ একটা বিশাল মিছিল যাচ্ছিল — ওর কেন জানিনা মিছিলটা ক্রস করা উচিৎ নয়, করলে নাকি ঐ লোকগুলোর উদ্দেশ্যে অসম্মান করা হবে।

যা হোক ঝমঝমিয়ে নামলো বৃষ্টি। আমরা ছুটলাম না; মিছিল কেটে নয়। মিছিল শেষ হবার পর — কীসের খোঁজে জানি না।

— মাথা গোঁজবার জায়গার খোঁজে নয়। মাথার ওপরকার কালো আকাশটাকে ছাড়িয়ে, শরৎকালের একটু পরে নীল আকাশের খোঁজে তুই জানিস তাতাই, আমি বড্ড বেশি পসেসিভ, তাই আমার কাছে কোথাও লুকিয়েছিল ওর জীবনের ৩য় নারীর কথা, ওরে ডায়েরীর প্রথম পাতায় ছিল তিন জনের নাম পরপর, প্রথম নামটা ওর মায়ের দ্বিতীয়টা আমার নাম, ৩য়, ওর কলেজের সেই সিনিয়র ওর জীবনের তৃতীয় নারী। তৃতীয় নারীর কাছে ছিল সেই ডায়েরী আমায় নিয়ে গিয়েছিলো যে তাদের বাড়িতে, আমার প্রিয় বন্ধু ও তার সম্পর্কের কথা বোঝাতে — আমার ক্ষোভ কমাতে। — বকছে তোকে, দাঁড়া। আমার গল্পও প্রায় শেষ। জানিস সবচেয়ে অদ্ভুত লেগেছিল যখন, সেদিন মাঝরাতে দেখেছিলাম সেই তৃতীয় নারী আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে একটা চিঠি লিখছে — যাকে কিনা আমি এগিয়ে দিয়েছি শ্মশানের পথে — কফিনে মোড়া, ফুলেতে ঢাকা, লিখেছে — "তোর চিঠির অপেক্ষায় আছি, সবাই বলছে তুই নেই। আমি বিশ্বাস করি না।" সঙ্গে একটা কার্ড — টু মাই সন — ফ্রম ইওর মাদার। আমি ঠিক বুঝিনি ওদের মধ্যে আল্টিমেটলি রিলেশনটা কী ছিল। শুধু বুঝেছিলাম আমার সাথে সম্পর্কটা যে ডাইমেনশন থেকে ছিলো, ৩য় নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অন্য কোন মানসিক চাহিদা ঘিরে, হতে পারে তা দিদি — মাতৃতুল্য দিদি। তবুও কেন জানিনা আমার রাগ, দুঃখ, শোকের থেকে মাঝরাতে এই ধরনের পাগলামোটা আরো ভয়াবহ লেগেছিল। সারারাত সেদিন ভেবেছি ওদের সম্পর্ক নিয়ে, নিজেকে খুব কোণঠাসা, বখে যাওয়া মনে হচ্ছিল।

— কী খাচ্ছিস তুই? বাদাম? মা এখনো পাশে বসে। রাগ করিস না। আজ শেষদিন — অনেক কিছু বলার আছে। অথচ গুছিয়ে বলে উঠতে পারছি না, আসলে আমি ঠিক গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, খুব এলোমেলো কথা বলি, তাই না?

— সেদিন সারারাত ধরে ভেবেছি চেনা জানা এরকম চরিত্রগুলোর কথা — যেমন ধর শরৎচন্দ্রের বড়দিদি মেজদিদি। ভেবে ভেবে মনে হয়েছে — একটা লোকের চরিত্রে অনেক ডায়মেনশন থাকে। যার সামগ্রিকভাবে চাহিদা একজনকে পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। অনেকগুলো কমপ্লেক্স সম্পর্ক সমস্ত তৈরি হয় এইভাবে — একইসঙ্গে। তাই অনেক প্রশ্নের উত্তর না মিললেও মনে হয়েছিল আমার জন্যে যতটুকু অনুভূতি থাকার কথা ছিল, আমার ভাগেরটুকু নিয়েও বোধহয় ও কখনো আমায় ঠকায়নি। আই রেসপেক্ট হিম, আমি আমার অংশটা ঠিকই পেয়েছি। আচ্ছা, বল, যদি নাই ভাবতে পারতাম, তাহলেই বা কি করতাম। সারাজীবন ধরে কেবলই ভাবতাম, ঠকেছি মনে করতাম। যা হোক, আমি খুব পজিটিভ্। অর্ধেক জলভর্তি গ্লাসকে অর্ধেক শূন্য দেখা আমার স্বভাব নয়। তাই আমি ভালবাসি তাকে আজও। He is not part of my life but he is part of me. প্রতিদিনই ওকে রিয়েলাইজ করি। ওকে আমার বোধে, আমার প্রতিটি কাজে, বড় হওয়ার অনুভূতিতে — যা ধাঁধাঁ থেকে জটিল, খিদের থেকেও স্পষ্ট।

বকে চলেছি — ওফ্ ভাবছিস নিশ্চয়ই আমি কি সাংঘাতিক বন্ধু, কী রে আছিস তো নাকি? কী? ঠিক আছে? তোর বাবা একটু পরে কথা বলবে ...

— আমার মনে হয় তুই কিন্তু আমার থেকে অনেক বেশি ???। সেদিন, তুই বলেছিলি, সত্যিই — শৈশবের ঘোরটা আমার এখনো কাটেনি। সব না বুঝলেও, বুদ্ধিতে না কুলোলেও একটা জিনিস বেশ বুঝি, ভালবাসা বোধহয় একেবারেই হয়। একটিই থাকে, শুধু তার রূপটা বদলে যায়। মানে ... মানে ... ধর ভালবাসাটা দুধ, খালি যে পাত্রে রাখবি, সে পাত্রের আকার ধারণ করবি, হাসিস না ... যেমন ধর, তুই একটা মেয়েকে ভালবাসলি। আর তোদের সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো না। এরপর তুই দেখবি, তুই যাকে ভালবাসছিস নেক্সট টাইম বা তোর ভাললাগার তার সাথে প্রথম জনের কোথাও না কোথাও তুই মিল ঠিকই খুঁজে পেয়েছিস আর খুঁজে পেয়েছিস বলেই হয়তো ভালবেসেছিস।

— জানিনা তুই প্রাজ্ঞ, কী ভাবিস। তবে আমি এই রিয়েলাইজ করেছি।

— খেতে ডাকছে? আমার একটি বেড়াল আছে জানিস। এই যাবো এখন। কোত্থেকে চলে এসেছে। তুই নিশ্চয়ই ভাবিস

আমি খুব বেখাপ্পা লিঙ্কনেস ??? কথা বলি।

জানিস, যেদিন বুঝলাম তোর প্রতি আমার এক্সপেকটেশনটা বাড়ছে, তোর প্রতি ছোট ছোট কথায় আমার খারাপ লাগছে, আগুনে তলিয়ে যেদিন খুঁজে পেলাম — তোর সাথে তাঁর মিল, আমার সেই প্রিয় বন্ধুর। কোথায় জানিস — তোর রুক্ষতায় তোর রুক্ষ কথার মতো। সে সারাক্ষণ এরকম ঝগড়া করত। তোর মতো। তাই তোকে বলি, একটু ভাল করে কথা বল — কারণ তোর রুক্ষতাটাই আমার ভাল লাগে। যে ভাললাগাটা উচিৎ নয়, কারণ আমি তোর থেকে বয়সে বড়, আচ্ছা বয়সে বড় হলে বুঝি বন্ধু হওয়া যায় না? মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতা পড়িস?

— "কাল থেকে আসব তোর বাড়ি" — একটা কবিতার নাম — শোনাই তোকে — ঘুমোস না — অ্যাই তুই জেগে আছিস?

"স্বপ্নে তো পুরুষ ছিল, তুমি কেন সেই স্বপ্নে এখন।
দশ বছরের ছোট তুই অনুরাধাদির ছেলে।
দশ বছর দূরে থাক, তুই আমার থেকে মোটে ৯ মাসের ছোট —
কী করবো বল, আয়নার দিকে তাকিয়ে এবার নিজেকে বলতে হবে —
হৃদয় অবাধ্য মেয়ে
তাকে কী শাস্তি দিবে দিও।

আবার কবিতা শোনালাম বলে রাগ করলি? তুই তো কবিতা ভালবাসিস? আজ কলেজে তোর সাথে ঝগড়া হয়েছে। তাই মন ভালো নেই। ১ ঘণ্টা হয়ে গেছে প্রায়। অনেক রাত হল, তোর বাড়িতে তো খুব প্রবলেম; শেষ অনুরোধ করবো — রুক্ষতা দিয়ে আমায় বাঁধিস না। একটু ভাল করে কথা বল। ভাবতে দে যে ওর মতো নস বরং আর সবার মতো। পারলে যোগাযোগ রাখিস। অনেক বিরক্ত করলাম। রাখছি। শুভরাত্রি। □

শুচিস্মিতা রায

স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র

স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এই তিনটিই একে অপরের পরিপূরক। সুষ্ঠ সমাজতন্ত্র-ই বহন করে সার্বিক গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সেখানে উঠে আসে প্রকৃত স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তারপর পেরিয়ে গেছে ৫৪টি বছর। কিন্তু এই ৫৫তম বছরের স্বাধীনতার পরেও আমরা পরাধীন। আমরা পরাধীন আমাদের স্বাধীন দেশের মধ্যে। ১৯৫১ সাল থেকে নেওয়া শুরু হয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। প্রতিটি পরিকল্পনাতেই অবশ্য কৃষিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গুরুত্ব শুধুই পরিকল্পনার খসড়াতেই লিপিবদ্ধ রয়ে গেছে তা আর বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে ২০০২ সালে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের পাঞ্জাব কিংবা হরিয়ানায় হেক্টর প্রতি যা উৎপাদন হয়, অস্ট্রেলিয়া অথবা চীনে এর থেকে কম পরিমাণ জমিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেশী। সেই সংখ্যায়ে আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাংখ্যমান বাড়ছে সেই আন্দাজে বাড়ছে না আমাদের দেশের জমিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন। কৃষির সঙ্গে শিল্প জগতেও চলছে চরম হতাশা ও নৈরাজ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে দিনের পর দিন তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারী হাতে। এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সমঝোতা এবং বিশ্বায়নের কাছে নতিস্বীকার। আমাদের দেশে শিল্প থেকে সামরিক সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ছায়া কোথাও প্রকট কোথাও বা প্রচ্ছন্ন আকারে বর্তমান। বিনোদনের মধ্যে পাওয়া যাবে না স্বাধীনতা। সেখানেও বিশ্বায়নের হাতছানি। সমাজতান্ত্রিক এহেন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। স্বাধীনতা। যার প্রকৃষ্ট এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক গুজরাট। আমাদের সংবিধানে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এখানে যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মের উপাসনা করতে পারেন। কিন্তু এইসব কিছুই যেন মিথ্যা, প্রমাণ করে দিতে চলেছে — সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া গুজরাটের নারকীয় হত্যাকাণ্ড। কখনো ভারত মহাসাগরের নাম হিন্দুসাগর করার চেষ্টা; কখনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস কখনো বা গুজরাটের হত্যাকাণ্ড যেন আমাদের বলে দিচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা কেবলই সংবিধানের পাতায়, বাস্তবে নয়।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ৫৪ বছর পরেও আমাদের স্বাধীনতা কোথায়। সেকি শুধু কাগজে-কলমে। আসলে ৫৫তম বর্ষে দাঁড়িয়েও আমরা পরাধীন। আমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে এক সুস্থ সমাজ এবং পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা যার মধ্যে প্রতিনিয়ত আমরা অনুভব করতে পারবো আমাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে। তখনই স্বাধীনতা শুধু কাগজে কলমে হবে না, হবে বাস্তবে রূপায়িত। তাই স্বাধীনতার ৫৫তম বর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের শপথ নিতে হবে স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে।

সৌরিশ মুখোপাধ্যায়
বিজ্ঞান বিভাগ

কল্পবিজ্ঞান

VIRTUAL IMAGE : UFM

সাল 2284, Zenta 2X গ্রহের স্যাটেলাইটে কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। ফলতঃ বিভিন্ন গ্রহের সঙ্গে তাদের যোগাযোগে কিছুটা বাধা বিঘ্ন হচ্ছিল। কেবলমাত্র, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সম্ভব ছিল বিকল্প উপায়ে কিন্তু সেই উপায় ছিল প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য। কোনো উপায় না দেখে Zenta 2X গ্রহের বাসিন্দা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হয়। তারা স্যাটেলাইট ঠিক করে দিতে পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করে।

পৃথিবীতে সেই খবর আসতে আসতেই বিভিন্ন মহাকাশবিজ্ঞানীরা আলোচনায় বসেন। আলোচনায় ঠিক হয় তারা পরের দিনই David, Sam, Lucy, Harry আর John কে পৃথিবী থেকে Zenta 2X-এ প্রেরণ করবে। এই দলের অধিনায়ক হিসেবে থাকবে David। আলোচনা অনুযায়ী পৃথিবী থেকে পাঁচজন স্যাটেলাইট স্পেশালিস্টকে পাঠানো হল।

Zenta 2X গ্রহে পৌঁছে তারা সেই গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। সেখানকার বাসিন্দাদের দেহ মানুষের মতন হলেও মাথাটা টিকটিকির মত। Sam-এর কাছে এক বিশেষ যন্ত্র ছিল যা দিয়ে David-এর দল ওই গ্রহের বাসিন্দাদের ভাষা সহজেই বুঝতে পারছিল, আর যখন David-এর দল কথা বলছিল তখন শব্দ যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ওই গ্রহবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় বের হচ্ছিল। David-এর দল খুব শীঘ্রই নিপুণভাবে স্যাটেলাইট ঠিক করে দিল। পুরস্কারস্বরূপ একটা করে হীরে আর আত্মরক্ষার জন্য একটা করে Laser gun পেল।

পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে এই খবর পৌঁছতেই আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। কিন্তু একজন, নাম Henry, খুশি হতে পারেনি David-এর দলের সাফল্যে। Henry বিদ্যা, বুদ্ধিতে David-এর সমকক্ষ হলেও তার উগ্র স্বভাবের জন্য সকলের কাছে প্রিয় হতে পারে নি। তাই David-এর উপর একটা রাগ ছিল, সে চাইত David-কে মেরে ফেলতে। এই লক্ষ্য নিয়ে সে তৈরি করল Virtual Image [সর্বাধিক উন্নত Robot]। Henry তার নাম দিল UFM [Ultimate Fighting Machine]।

এইদিকে David পৃথিবীতে ফিরে এল, পেল প্রচুর সম্বর্ধনা। তার গাড়ি পার্কিং করা ছিল একটা ঘরে। সে সেই ঘরের দরজার সামনে যেতেই automatic laser ray তার রেটিনা চেক করে গাড়ির নাম্বার চিনে নিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা robot-কে নির্দেশ দিল আর ঘরের দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। Robot গাড়ি নিয়ে বাইরে এসে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে চলে গেল। David গাড়ির দিকে এগোতেই গাড়ির দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। David গাড়িতে বসতেই গাড়ি তাকে বলল Welcome David, your destination please. David জানাল Home। ক্লান্ত David-এর তখন ঘুম পেয়েছিল, গাড়ি তা বুঝতে পেরে একটা শান্ত গান চালিয়ে দিল। গান শুনতে শুনতে David ঘুমিয়ে পড়ল। গাড়ি নিজে থেকেই চলছিল। কিছুক্ষণ পর গাড়ি David David করে ডাকতে লাগল। David চোখ খুলে দেখে যে সে বাড়ি পৌঁছে গেছে। এখন তার ক্লান্তি অনেকটা কেটে গেছে। বাড়ির দরজায় এসে সে ছোট একটা scanner-এ বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। বাড়িতে এসেই সে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরে দুটো তুড়ি মারতেই রান্নাঘরে আলো জ্বলে উঠল। রান্নাঘরের একটা কোণে বিভিন্ন দেশের পতাকা রয়েছে। তাদের উচ্চতা হবে প্রায় 3 cm। সেই জায়গাতেই একটা বাক্স রয়েছে। সে একটা দেশের পতাকা বেছে নিয়ে বাক্সে রাখল, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাক্সের গায়ে ফুটে উঠল Your credit card number please. David তার credit card number দিল। তারপর ফুটে উঠল সেই দেশের খাবারের মেনু। David তার পছন্দ মতন খাবার বেছে নিয়ে OK Button-এ চাপ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে পছন্দসই খাবার বাক্সে হাজির। David তার খাবার নিয়ে খাবার ঘরে প্রবেশ করে তুড়ি মারল সঙ্গে সঙ্গে ঘরে light, A.C., T.V. চালু হয়ে গেল। David T.V. দেখছিল আর খাচ্ছিল।

হঠাৎ খুটখাট আওয়াজ। David-এর সন্দেহ হল বাড়িতে কেউ ঢুকে পড়েছে। অবশ্য সে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকল যে, যেই ঢুকে পড়ুক তাকে মারলে David-এর জেল হবে না। কারণ যে কোনো দুটো মানুষের বুড়ো আঙুলের প্রকৃতি এক হবে না। আর যাদের তার ঘরে ঢোকার কথা তারা সকলেই এখন তারই মতন ক্লান্ত। সে ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে উপহার পাওয়া laser gun-টা বের করল। সামনের ঘরের অন্ধকার থেকে হঠাৎ Lucy বেরিয়ে এল। David অবাক হয়ে গেল কারণ, Lucy-র এখন ক্লান্ত হয়ে তার নিজের বাড়িতে থাকার কথা। David আর Lucy কিছুক্ষণ তাদের যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। David কিন্তু খেয়াল করছিল Lucy এমনভাবে তাদের Zenta 2X গ্রহে যাত্রা নিয়ে কথা বলছিল যেন সে সেই যাত্রার যাত্রী ছিল না। ইতিমধ্যে David-এর খাবার ফুরিয়ে গেছে। সে তার খাবার প্লেট রান্নাঘরে রাখতে গেছে। ফিরে এসে দেখে Lucy-র কোনো

চিহ্ন নেই তার বদলে বসে আছে Sam। David তাজ্জব বনে গেল। Sam David-কে জানাল Lucy একটু দোতলায় গেছে আর অবাক হওয়ার কিছুই নেই সে Lucy-র সঙ্গেই এসেছিল, পাশের ঘরে ছিল। David-এর সন্দেহ হল কিন্তু কিছু বলল না। Sam-এর সঙ্গে David কথা বলার সময় পর্যবেক্ষণ করছিল Sam-কে ভাল করে। David লক্ষ্য করল Sam অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে যা কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষ প্রতি মিনিটে ২০ বার পলক ফেলে। David সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করল "Who are you?" Sam তখন থমকে গেল। আস্তে আস্তে Sam-এর মুখ মিলিয়ে যেতে লাগল। তার বদলে আসতে লাগল পরিচয়হীন এক চেহারা। পুরো চেহারা পালটে যেতেই David-এর উপর সে আক্রমণ করল। David কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে অন্য ঘরের দিকে পালাল। পালাতে পালাতে সে তার বেডরুমে পৌঁছল। সেখানে টেবিলের ড্রয়ার থেকে বন্দুক বের করে গুলি চালালো। কিন্তু গুলির গতিবেগের থেকে তার সরে যাওয়ার গতিবেগ অনেক বেশি। David তখন বুঝল এ কোনো Virtual Image। Virtual Image David-কে আবার তাড়া করল। বেডরুমের আরেকটা দরজা দিয়ে David পালাল। পালাতে পালাতে সে পৌঁছল রান্নাঘরে। তার প্লেট রাখার সময় laser gunটা সে সেখানে পেয়ে গেল। Laser gun হাতে তুলে ট্রিগার চাপ দিল লক্ষ্য করে। ব্যস, Virtual Image মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে David পুলিশকে ফোন করল। Virtual Image কে ভালো করে পরীক্ষা করে জানতে পারল, Henry David-কে মারার জন্য Virtual Imageটাকে পাঠিয়েছিল।

পুলিশ আসতেই David এই প্রমাণ পুলিশের হাতে তুলে দিল। পুলিশ আর David Henry-র বাড়িতে গিয়ে দেখে Henry আত্মহত্যা করেছে। কারণ সে নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চায় নি। □

কুনাল নাথ
প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

মানবতার কলঙ্ক — গুজরাত

Blood and destruction shall be so in use and dreadful objects so familiar that mothers shall but smile when they behold their infants quartered with the hands of war, all pity chok'd with custom of fell deeds.

Julius Caesar, Act III, Sc. 1.

বর্বরতা কোন নতুন শব্দ নয়। বিশশতক জুড়ে, একুশ শতকের একেবারে সূচনা ভাগে দ্রুত, কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে বর্বরতার ক্রমপাঠ। গুজরাত দাঙ্গার উপলক্ষ হিসাবে হাতে পাওয়া গেল গোধরা। উপলক্ষ? উপলক্ষই। সচেতনভাবেই শব্দটা ব্যবহার করা যায়। কারণ সাম্প্রদায়িক আক্রোশ ও ঔদ্ধত্যের চেহারা নিয়ে বর্বরতার যে প্রসারিত প্রকাশ দেখা গেল আহমেদাবাদ, মেহসানা, ভদোরায় তার জন্যে জমি তৈরি হচ্ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। আক্রোশের এমন বিস্ফোরণ যা ফেব্রুয়ারীর শেষ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ আগুন, রক্ত, ধর্ষণ ও লুঠতরাজে বর্ণাঢ্য হল গুজরাত, তার জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছিল বহুদিন আগে থেকেই।

শুধু একটা উপলক্ষর প্রয়োজন ছিল। দাঙ্গার জন্য নয়, রাষ্ট্রীয় সাহায্যপুষ্ট গণহত্যার জন্যে। গোধরা স্টেশনে উত্তেজক ঘটনা ঘটে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি। ৭.৫০ মিনিটে সবরমতী এক্সপ্রেস স্টেশন ছাড়ে। ৮.০৯ মিনিটে এক কিমি দূরে সবরমতী S-6 কামরায় সংগঠিত আক্রমনে অগ্নিসংযোগ ঘটান হয়। ট্রেনের চারটি কামরা পুড়ে ছাই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা অযোধ্যা থেকে 'পূর্ণ আহুতি' কর্মসূচি সেরে ফিরছিলেন। মৃত ৫৭, আহত ৪৩, এবারে। বলি ২৭ শে ফেব্রুয়ারির কথা। ঐ দিন গুজরাতের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস-এ আগুন লাগিয়ে উত্তেজিত জনতা ৫৭ জন করসেবককে হত্যা করে। কারা আগুন লাগালো? সংখ্যালঘুরা? সরকার পক্ষ থেকে কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই বলা হয় যে এটা একটা ISI-এর ষড়যন্ত্র। নিঃসন্দেহে এটা একটা অপরাধ। কিন্তু তারপরই গুজরাতে ছড়িয়ে পড়লো সাম্প্রদায়িকতার আগুন। শুরু হল নির্বিচারে হত্যা ও নারীমেধযজ্ঞ। এবারের দাঙ্গার সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য হলো যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা ভয়াবহ মাত্রায় অত্যাচারিত হয়েছেন। ৬ই মে Outlook ম্যাগাজিনে অরুন্ধতী রায় তাঁর 'Gujarat Democracy and Fascism' প্রবন্ধে লিখেছেন যে বরোদা নামে অরুন্ধতীর বন্ধু ফোনে জানায় যে সইদা নামে তার এক বান্ধবী দুর্ভাগ্যক্রমে উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে ধরা পড়ে। জনতা তার পেট চিরে তার মধ্যে জ্বলন্ত কাপড় ঢুকিয়ে দেয়। বনস্কন্থ জেলার দীসায় এক মুসলিম ডাক্তারকে রোগী দেখার নাম করে বাইরে এনে খুন করা হয়। সবার চোখের সামনে এক মায়ের পেট থেকে বাচ্চা বের করে অস্ফুট সেই মানব শিশুকে তলোয়ারের মাথায় গেঁথে নিশানের মত তুলে দেখিয়েছে সবাইকে। তারপর ঐ তলোয়ারে গাঁথা বাচ্চাটার সঙ্গে সবাইকে কাছের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলিয়েছে — বল জয় শ্রীরাম। যারা বলেনি, দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়নি। এককোপে কেটেছে। গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে বাচ্চাকে বার করে দুটুকরো করে কেটে আগুনে ছুঁড়ে ফেলেছিল। সবার সামনে একজন মহিলাকে রাস্তায় ওরা বলাৎকার করলো। তারপর খুব শান্তভাবে তার হাতদুটো কেটে ছুঁড়ে ফেলেছিল আগুনে। যখন বন্দী শিশুরা একফোঁটা জলের জন্য কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছে, তাদের মুখে ঢেলে দিয়েছে কেরোসিন তেল। কোন মেয়ে, সে যে বয়সেরই হোক বাঁচার জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য বেরিয়েছে, তাদেরকেই রাস্তায় ফেলে ধর্ষণ করেছে, তারপর খুন করেছে। ২৫ শে মার্চ আমেদাবাদ শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ির সামনে বাস স্টপেজের কাছে গীতাবেনকে নগ্ন করে খুন করা হয়। তিনি হিন্দু ছিলেন। তাঁর অপরাধ তিনি এক মুসলিম যুবককে ভালোবেসেছিলেন। যখন হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীরা সেই যুবককে খুন করতে আসে তখন গীতাবেন তাদের পথ আগলে প্রেমিককে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

২৮ শে ফেব্রুয়ারি গুজরাত বন্ধের দিন (গোধরার ঘটনার প্রতিবাদে) থেকেই হত্যা ও ধ্বংসের কাজ শুরু হয়। চারিদিকে যখন আগুন জ্বলছে তখন দমকল কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। কারণ পুলিশের সাহায্য ছাড়া আগুন নেভাতে গেলে দাঙ্গাকারীদের হাতে মরতে হবে। আর পুলিশ তাদের সাহায্য করতে তৈরি নয়। গুজরাত দাঙ্গায় সবথেকে অবাক করা ঘটনা হল প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা। প্রশাসন এই গণহত্যায় বাধা দেওয়া তো দূরে থাক বরং একে উৎসাহ দিয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছে। পুলিশ দাঙ্গা দমনে কোন কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। এটা গোটা দেশের পুলিশ বাহিনীর কাছে লজ্জা। কিন্তু তার চেয়েও বড় ঘটনা হল পুলিশকে কিভাবে শাসকদল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে গুজরাত তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। দাঙ্গা শুরু হবার তিনদিনের মধ্যেই, সেনাবাহিনীর রাজ্যে পৌঁছে গেছিল অথচ বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার দিনের পর দিন তাদের কাজে লাগায়নি। সাধারণ মানুষ দূরে থাক, গুজরাত বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য মহঃ এহ্সান জাফরীকে খুন করার হুকুম দেবার পর তার বন্ধু, পার্টি, ও সহকর্মীরা তার নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের কেন্দ্র ও রাজ্য সর্বস্তরের উচ্চ পদাধিকারীগণকে বারবার অনুরোধ করেন। তা সত্ত্বেও আরো ৪০ জনের সঙ্গে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। তার বাড়ির মেয়েদের নগ্ন করে পুড়িয়ে মারা হয়। সবথেকে ন্যক্কারজনক ভূমিকা ছিল পুলিশের। পুলিশ দাঙ্গা দমনের নামে বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের গুলি করে মেরেছে; যখন তারা পালাতে গেছে তখন তাদের ভুল দিগ্‌দর্শনের সাহায্যে আক্রমণকারীদের সামনে ঠেলে দিয়েছে। তাদের গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আগুন জ্বালাবার জন্য দাঙ্গাকারীদের ডিজেল যোগান দিয়েছে। লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে।

২৭ শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর ছয়-সাত মাস কেটে গেছে। গুজরাতে আগুন নেভেনি। বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে গুজরাতে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদের একটি অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বিশেষত হোটেল, বেসরকারী, পরিবহন, জামা-কাপড়ের বিক্রয় ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাই এক্ষেত্রে খুব সচেতনভাবে অপারেশন চালানো হয়েছে। তার আগে পরিকল্পনামাফিক এগোনো হয়েছে। ধাপে ধাপে। দোকান, কারখানা, গ্যারাজের খোঁজ ভোটার লিস্টে পাওয়া যাবে না। তাই কোম্পানীর রেজিস্টার, রেভিনিউ এন্ড সেলস্ ট্যাক্স বিভাগের গোপন ফাইল থেকে সংখ্যালঘুদের দোকান,

কারখানা, গ্যারাজ, হোটেল চিহ্নিত হয়েছে। শুধু দোকান, কারখানা, গ্যারাজ, হোটেল নয়, রক্ষা পায়নি 'দিন আনি দিন খাই'-এর জীবনযাপনের অভ্যস্ত মানুষজনও।

প্রাথমিক হিসেবে হোটেল পুড়েছে বা লুট হয়েছে প্রায় ১১৫০টি বা তারও বেশী। এক্ষেত্রে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকা। আমেদাবাদে হোটেল শিল্পে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ২০ হাজার হোটেল কর্মীরা প্রাণ হারিয়েছে, এর মধ্যে প্রায় ৬৭০০ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।

পরিবহন শিল্পে আঘাত এসেছে মারাত্মক। জাতীয় সড়কের উপর থাকা গ্যারেজের ক্ষতি হয়েছে ১২ কোটি টাকা। ট্রাক, লরি পুড়েছে অনেক। আমেদাবাদ, সুরাট, বরোদা, গোধরা এবং হিম্মতনগরে বসবাসকারী ট্রাক মালিকদের সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি টাকা। গুজরাতের ট্রাক অপারেটরদের বিমা প্রাপ্য প্রায় ৮৩০ কোটি টাকা। শিল্প সংস্থাও বাদ যায়নি ধর্মীয় আগ্রাসন থেকে। হালোলে প্রায় ১৮টি ফ্যাক্টরি জ্বলেছে। ছাই হয়েছে নারোদার ফল বাজার। মেহসানা, কাটোরা, গোধরা সব জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত দোকান শিল্প সংস্থা পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিবাহিনী। বয়নশিল্পে খ্যাতি আছে গুজরাতের। সুরাটে এই শিল্পে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। এমনকি হ্যান্ডলুম এক্সপো চলছিল। হিংস্র উন্মত্ত বাহিনী হই হই করে এক্সপোতে ঢুকেছে, কাশ্মীর আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া ব্যাপারীদের স্টল থেকে দামী শিল্পসামগ্রী বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আগুনে।

যদিও দেশের শীর্ষ রাষ্ট্রনায়করা বলেছেন যে, গুজরাতের ঘটনা ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু সত্য এটিই, যে ক্ষতি গুজরাতে হয়েছে, তার ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তাও থমকে যাবে সন্দেহ নেই। আরও দরিদ্র, আরও বেকারী, আরও অর্থনৈতিক মন্দা আগামীদিনে গুজরাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

এটা এখন ভারতবাসীর কাছে জলের মত পরিষ্কার যে এই নৃশংস ঘটনাটি সুপরিকল্পিত। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সরিয়ে কিছু উগ্র মৌলবাদী সংগঠন এই কাজ করেছে। এতে আমাদের দেশের স্বনির্ভরতার নীতিই শুধু বিসর্জন হয়নি, হয়েছে দেশের সম্পদ বিক্রয়েরও ব্যবস্থা। আর একাজ তারাই করছে যারা আমাদের দেশটাকে দু-হাতে লুট করতে চায়। তাদের অঙ্গুলি হেলনে, দেশের সরকার তাদের তল্পিবাহক হিসাবে সহায়ক শক্তির কাজ করছে। সর্বস্তরের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও অভাব বাড়ছে। তাই গুজরাটের ঘটনাকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করেই আগামী দিনে এই বিষবৃক্ষকে ভারতবর্ষে রোপণ করে জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের শাসন ক্ষমতার একটা অংশ লুণ্ঠনকারী শোষকদের প্রতি নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাও অবাধ দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের ফল ভোগ করতে চায়। তাই জাতিদাঙ্গাকে এ ব্যাপারে মহৌষধ হিসাবে ব্যবহার করাটা সহজ কারণ এতে যারা দুঃখ দুর্দশার শিকার তাদের মধ্যে বিভেদ ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হবে। কাজেই গভীর চক্রান্তের ফলশ্রুতি এই গুজরাটের লজ্জা ও ঘৃণার ঘটনা।

আমরা রবীন্দ্রনাথ পড়ি। অথচ তার বিশ্বাসের জগৎ হোক বহুদূরে। আমরা বড়ো শান্তিপ্রিয়। নিরাপদ গুপ্তের মত আপন কোটরে আত্ম-মৈথুনে মগজ রমণে মগ্ন। আমরা রাষ্ট্রদ্রোহ বাঁচিয়ে মুক্তির কথা বলি। আমরা হত্যাকারীকে আলোচনা টেবিলে ডেকে শান্তিপ্রস্তাবের নামে স্তুতি করি। তারই শ্রীচরণ ছুঁয়ে বলি, সম্বরণ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর, করুণা কর। আমরা তোমার করুণাপ্রার্থী। আশ্চর্য! পরম আশ্চর্য! জৈবিক সত্য, মানবিক সত্যের নির্লজ্জ পদদলন! যে দেশে হত্যাকারী আর নিহত মানুষের প্রিয়জনেরা এক সাথে বসে, আক্রমণকারীর কাছে আক্রান্ত শক্তি মাথা নোয়ায়, সে দেশ মানবতার কলঙ্ক। এটাই তো মানবিক সত্য, হত্যাকারীকে সরাসরি বলা, আর নয় এবার যদি মারো তাহলে তোমার মারের হাত ধ্বংস হবেই, সুকান্তের সেই অগ্নিদীপ্ত অভিজ্ঞান —

"আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই,
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।"

কোথায় সেই উদ্ধত বিবেক! প্রতিবাদী মনুষ্যত্ব, যে বিনাশ এবং মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলবে, 'ঢের সয়েছি, এবার যুদ্ধ মুখোমুখি'। তুমি গান্ধীকে মেরেছো বারে বারে। জৈনধর্মের হাজার বছরের সাধনাকেন্দ্র কলঙ্কিত করেছো। জাতীয় সঙ্গীতে উচ্চারিত 'গুজরাত' শব্দটি তোমার ধর্ষণের শিকার। তোমাকে ক্ষমা, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ আরও কান্না, আরও মৃত্যু, আরও রক্তপাত। জানি একথা ভাবা যত সহজ, বলা এবং করা ততই কঠিন। মধ্যপন্থী, নরমপন্থীদের জন্য কবিতা-উৎসবেই শ্রেয়, এসো আমরা 'ধ্বংসস্তূপে আলো জ্বালাই'। রুদ্ধদ্বারকক্ষে সভা করি, পাতার পর পাতা প্রস্তাব গ্রহণ করি, তারপর একবার, শুধু একবার বলি, এ বড়ো অন্যায়! এ অন্যায় কেন হল, আসুন তার বিচার করি। বিচারে বিচারে কেটে যাক্ আমাদের মূল্যবান মুহূর্ত, ক্ষতি কি? জানি না রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ্যা যারা ফ্যাসিবিরোধী বজ্রকণ্ঠী তারা থাকলে কি করতেন! তারা বলতেন, 'অনেক হয়েছে গবেষণা নন্দনচর্চা, এবার মানবতার মহামিছিল শুরু হোক্, ধ্বংসস্তূপে গুজরাত অভিমুখে, চল চল গুজরাত চলো, নরদানবদের বিনাশ করো'। বিপন্ন গুজরাত তোমাদের ডাকছে, ঐ ডাকে সাড়া দাও, দূরে দাঁড়িয়ে হা হুতাশ কোরো না। একেবারে ঠিক কথা। গুজরাত আর বাংলা, পশ্চিম আর পূর্ব, একসাথে দাঁড়াক, হাতে হাত রেখে, প্রাণে প্রাণ রেখে, দরদে দরদ গেঁথে। একই দুঃখ, একই শোক, একই দহনে ভরে উঠুক চিত্ত, পুণ্যতীর্থ — মহামানবের মহাভারত। যে ভারতে, ধর্মদানবদের ঠাঁই নেই, হত্যাকারীর ক্ষমা নেই, সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক নেই, বর্বরতার চিহ্ন নেই। সেই ভারত, সেই স্বদেশ হোক্ আমাদের লক্ষ্য ও স্বপ্ন।

Ref.- গণশক্তি পত্রিকা, যুবমানস, লালদিঘী, কানাকড়ি, Times of India, Outlook.

রিলামালা কিস্কু
প্রথম বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা
ক্রমিক সংখ্যা — ১৩২
আশুতোষ কলেজ।

দংশন

প্রথম ভাগ

পুজোর সময় এদিকটায় বড় ভীড় হয়। কলকাতার এটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। কলকাতা নগরীর ভিড়টাই সব। দূরে এক চিলতে আকাশে একটি ছোট্ট মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ফানুস উড়ছে বিজ্ঞাপনের। মানুষের বেশ ঢল নেমেছে রাস্তায়। কারও হাতে রঙচঙে প্লাসটিক ব্যাগ, আইসক্রিম কোন্‌স, কারও বা হাত খালি, আবার কিছু মানুষ হাসে, কেউ প্রাসাদ নগরীর মাধুর্যে বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখে চারদিক চেয়ে দেখে, কেউ কিছুই অনুভব না করে নীরবেই হেঁটে চলে, কেউ আবার তার মনকে চার চোখের চাহনিতেই সীমাবদ্ধ রাখে — রাখতে চায়। অথচ প্রত্যেকেই ব্যস্ত।

এই ব্যস্ততা সমরেশের বহুদিনের পরিচিত। বাসের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে শহর কোলকাতার এই শহুরে জীবনযাত্রা সে রোজ দেখে। তার দেখতে ভাল লাগে। এখনো এক মাস বাকি, অথচ পুজোর গন্ধ চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরে-অদূরে গ্রামের মেঠো পথের ধারে যে শিউলি ফুলটি ফুটে আছে, তার গন্ধ যেন ব্যস্ত কলকাতার কংক্রীটের চাদরের কোন এক কোণ থেকে ভেসে আসছে। সমরেশের মন খুশিতে ভরে উঠেছে। কখন কে জানে — অজান্তেই সে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে থাকে। গানের সুর, গানের কথা সব উলোট-পালট হয়ে যায় তার ভাবুক মনের কাছে। নিজের সঙ্গে একান্তে সে কিছুক্ষণ থাকতে চায়। কিন্তু মনের যেখানে তার মা, তার স্ত্রী, তার সন্তান ও তার অনেক দুঃখে গড়ে তোলা যে আশার সংসার আছে, তা তার মনে বারংবার ভেসে ওঠে। অসহ্য ভিড়ে তার দম আটকে আসে।

পাশের বাড়ি শাশুড়ি বউয়ে আজও আবার ঝগড়া লেগেছে। রাস্তার মোড়ে একটা কুকুর কখন থেকে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। আকাশে জমাট মেঘ। সমরেশের চোখে ঘুম নেই। জানালার ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে সে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

— অ্যাই শুনছ, আজকে মাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, বুঝলে? মার অপারেশনটা কিন্তু এবারই করিয়ে নিতে হবে, নইলে ...। কিগো, তুমি শুনতে পাচ্ছ না? কী হল, আমি তোমাকে বলছি — সমরেশ চমকে ওঠে। শীলার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। বড় বড় চোখ করে সমরেশের হতভম্ব চোখ খুঁজে বেড়ায় শীলার চোখকে।

— 'অ্যা! কি হয়েছে?' সে প্রশ্ন করে।

রাত্রি বেড়েছে। আকাশের মেঘ কেটে গেছে। টুকরো চাঁদ দেখা যাচ্ছে একপাশে। রাস্তার ল্যাম্পের আলো অকারণেই সমরেশের এই ছোট্ট ঘরে এসে ঢুকেছে। ঘুম আসছে না তার। মনে ভিড় করে আছে নানান চিন্তা — অনেক দুশ্চিন্তা। মায়ের অপারেশনটা এবার করতেই হবে, নইলে এবার আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু তার জন্যে তো বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। কোথা থেকে আসবে এত টাকা! শিহরিত হয়ে ওঠে সে।

অপুর ছোট্ট হাত কখন যেন তার বুকে এসে পড়েছে। সমরেশ পাশে চেয়ে দেখে। পাঁচ বছরের ছেলেটার মুখে এখনই কেমন যেন অদ্ভুত শীর্ণতা। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছোট্ট চোখ দুটিতে যেন কত আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা বাসা বেঁধে রয়েছে। সমরেশের চোখ বুজে আসে গভীর ঘুমের আচ্ছন্নতায়।

দ্বিতীয় ভাগ

সকালবেলা স্কুলে যাবার আগে খাওয়া নিয়ে বায়না অপু রোজই করে। প্রতিদিনই বৃদ্ধা ঠাকুমা সরোজবালাকে নাতির এইসব আবদার মেনে নিতে হয়। কিন্তু শীলা বরদাস্ত করতে পারে না। সে মাঝে মাঝেই অপুকে ধমক দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। সরোজবালা পাশের ঘরে চলে যান।

অপু স্কুলে চলে গেছে। সকাল গড়িয়ে বেলা হয়েছে। খবরের কাগজ পৌঁছে গেছে সমরেশের ঘরে। কাপের চা সরবত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অ্যাসট্রেতে সিগারেটের পাহাড় জমছে। পাশের বাড়ির ছাদে কাকেদের সভা বসেছে আজ। বিজ্ঞাপনের হাওয়া আজকাল খবরের কাগজগুলিকেও ছাড়েনি। জামাকাপড়, তেল, সাবান, শ্যাম্পু, টিভি, কি নেই! সব আছে।

— 'তুমি কি আজ অপিসে যাবে না?' — কখন যেন শীলা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চারশো স্কোয়ার ফিটের সংসারের বোঝায় শীলার চোখে কালি পড়েছে। অধুনা অক্ষিকোটরগত সেই দুটি চোখের আবেদন, যেন এই দশ বছরে অনেকখানি ম্লান হয়েছে। তার গায়ের সেই ফর্সা রঙে যেন এই ঘরের মতোই কালো ঝুল পড়েছে।

'অপিস? হ্যা যাব।' সমরেশ বলে, — 'আচ্ছা শীলা তোমার মনে পড়ে, সেবার আমরা দার্জিলিং গিয়েছিলুম?'

— 'দার্জিলিং! পাহাড়, চা বাগান, হ্যাঁ — সব মনে আছে; এই, চলো না, এর মধ্যে কোথাও ঘুরে আসি।'

সমরেশেরও ইচ্ছা করে দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু যেখানে নিজের মায়ের অপারেশনের জন্য বিস্তর টাকা প্রয়োজন, যেখানে একমাত্র সন্তানের পড়ার খরচ ঠিকমতো চালানো যায় না, সেখানে হাজার দেড়েকের এই ছাপোষা বেসরকারী কেরানীর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষার দাম থাকে না — থাকতে নেই। সমরেশ চুপ করে থাকে। তার দৃষ্টি দূরের বটগাছের দিকে।

দশটা বাজে। বাসের জন্য অনেক বড় লাইন পড়েছে। হয়তো আজও সমরেশ ঠিক সময়ে অপিসে পৌঁছাতে পারবে না। রোজ রোজ এইভাবে লেট হবার জন্য তাকে বড়বাবুর কাছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি মারুতি গাড়ি বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।

— 'আরে, গৌরব না!' — সমরেশ বলে।

— 'উঠে আয়'।

গৌরব সমরেশের বহু পুরোন কালের বন্ধু। একটা সময় ছিল যখন গৌরব, সমীর, অশোক, সমরেশ, ... অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিল। সমরেশের অবস্থা অসচ্ছল হলেও কোন দিন সে বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে হীনমন্যতায় ভোগেনি। সময়ের সাথে সাথে প্রত্যেকেই পৃথক হয়েছে। সমরেশ মাঝে মাঝে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করত, কিন্তু ইদানীং তা আর হয়ে ওঠেনি। যা একটু গৌরবের সঙ্গেই ...।

গাড়ি রবীন্দ্র সদনের কাছে মোড় নিয়ে সোজা চলেছে।

— 'শীলা কেমন আছে রে?' গৌরব প্রশ্ন করে।

— 'ভাল'।

— 'আর মাসীমা'।

সমরেশ বলে, — 'মার অবস্থা ভাল না রে। পেটে পাথর জমেছিল বহু দিন ধরেই। কিন্তু আজকাল একটু বাড়াবাড়িই হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে অপারেশন এবার করাতেই হবে। কিন্তু ...' সমরেশ আর না বলে চুপ করে থাকে।

গাড়ি লিন্ড্সে ক্রস্ করে ডালহৌসীর পথ ধরেছে।

সমরেশ বলে, — 'আর নয় ভাই, আমি এখানেই নামব। থ্যাঙ্ক ইউ গৌরব।'

গেট খুলে পাশের ফুটপাথে নেমে পড়ে সে।

— 'আজ টিফিন আওয়ার্সে আমার অপিসে আসতে পারবি?' গৌরব বলে।

— 'পারব। কিন্তু কেন?' সমরেশ জানতে চায়।

— 'আয়, বলব।'

তৃতীয় ভাগ

অপিসে সারাদিনই কোন কাজ করতে পারেনি সমরেশ। বার বার গৌরবের কথা মনে পড়েছে। গৌরবই তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। গৌরবের বাবা পাড়ার বড় ডাক্তার ছিলেন। পরে তিনি কর্মক্ষেত্রে বদলি হয়ে যান। গৌরবও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভাল চাকরি পায়। এদিকে আর সমরেশের পড়াশোনা, বেশিদূর এগোয়নি। বাবা মারা যাবার পর ভাইবোনের লেখাপড়ার জন্য তাকে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। অবশেষে বোনেদের বিয়ে হওয়ার পর ভাইয়েরা সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে যে যার মত আলাদা হয়ে যায়। অভিমানী সমরেশও এরপর আর সম্পর্ক রাখেনি। এমনকি মার অসুস্থতার জন্যও কোনদিন ভাইয়েদের কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়নি। অবশ্য তারাও কেউ এগিয়ে আসে নি।

গলির মোড়ে একদল লোক জটলা সৃষ্টি করেছে। কি যেন একটা ঝামেলা হয়েছে। কলকাতায় তো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানী লেগেই আছে। মানুষ কেন পেট চালাবার জন্য এইসব লোক ঠকানোর উপায় অবলম্বন করে, তা সমরেশের জানা নেই, সে কোনদিন জানার চেষ্টাও করেনি। সে ভিড়কে পাশ কাটিয়ে বড় বাড়িটায় ঢুকে পড়ে।

এই সময়টায় অপিস ফাঁকাই থাকে। বাইরে একটা গুমোট গরম হলেও, এখানটা অনেকটাই ঠাণ্ডা। কিছু দূরে একটা টেবিলে জনাপাঁচেক লোক ওয়ার্ক কালচারের উপরে জোর ভাষণ দিচ্ছে। কিছু পোস্টারও দেওয়ালে, সাঁটানো রয়েছে; তার প্রসঙ্গ অবশ্য অন্য কিছু। বাঁ-দিক দিয়ে দোতলায় উঠলেই একদম সামনেই গৌরবের ঘরটা পড়ে। সে ধীরে ধীরে ঐ পথেই উঠে যায়।

— 'ভিতরে আসতে পারি?' সমরেশ বলে।

— 'কাম ইন'। ভিতরে ঢুকলে গৌরব বলে — 'আরে, এত দেরী করলি কেন? আমি তোর জন্যে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।'

পাশের ঘড়িটায় এইমাত্র ঢং ঢং করে তিনটে বাজল।

সমরেশ বলে — 'সরি ভাই। না মানে ...।'

— 'থাক।' — গৌরব তাকে থামিয়ে দেয়।

চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। গৌরবের রুমে বড় কাচের জানালা থেকে সামনেই বড় রাস্তাটা দেখা যায়। পুরোনো এসি মেশিনটার আওয়াজ বাইরের কোলাহলকে ঢেকে দিয়েছে।

— 'তোর অপিসটা বেশ সুন্দর।' — সমরেশ বলে।

গৌরব চুপ করে থাকে।

সুসজ্জিত কাপে চা এসে গেছে ইতিমধ্যেই।

— 'সমরেশ, আমি তোর জন্যে কিছু করতে চাই।' — গৌরব নীরবতা ভঙ্গ করে।

সমরেশ মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

— 'দেখ, মাসীমার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা ...।'

— 'কিন্তু— কিন্তু কেন?' গৌরবকে থামিয়ে দেয় সমরেশ।

— 'প্লিজ ভাই, তুই আমায় না করিস নে। মাসীমার জন্যে; নে এটা ধর।' সমরেশের দিকে একটি মোটা খাম বাড়িয়ে দেয় গৌরব।

— 'না, না, এ হয় না। এ আমি কিছুতেই নিতে পারি না।' সমরেশের আত্মসম্মানী মন যেন হঠাৎ জেগে ওঠে।

— 'আমি কি মাসীমার জন্য এটুকু করতে পারিনা বল। তুই আমাকে এভাবে বঞ্চিত করতে পারিস না, সমরেশ। নে এটা ধর।'

কম্পিত হাতে দ্বিধাগ্রস্ত সমরেশ খামটি নেয়।

— 'থ্যাঙ্ক ইউ।' গৌরব বলে।

টাকাটা বাস্তবিকই তার দরকার। অবশ্য সমরেশ জানে না কিভাবে গৌরবের এই ঋণ সে শোধ করবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! আজকাল এই সমাজে কোন্ বন্ধু এগিয়ে আসে বন্ধুর সাহায্য করতে? অথচ গৌরব নিঃস্বার্থভাবে এতগুলি টাকা সমরেশকে দিয়ে দিল।

— সমরেশ বলে, — 'একদিন আয় না আমাদের বাড়িতে, সবাইকে নিয়ে।'

— 'আসবো,' গৌরব উত্তর দেয়।

চতুর্থ ভাগ

পাঁচ হাজার টাকা। প্যান্টের পকেটটা খানিকটা উঁচু হয়ে আছে। নীচে এখন আর ওয়ার্ক কালচারের ভাষণ হচ্ছে না। তাদের বিষয় এখন গুজরাট। রাস্তার ঝামেলা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। দেখে বোঝার উপায়ই নেই এখানে কিছু হয়েছিল। সমরেশের হাঁটায় দ্রুততা এসেছে। মনের কোন এক কোণ থেকে জীবনের হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে পাচ্ছে সে। বহু চিন্তার অবসান হয়েছে। তার সংসারের মুখে সে হয়তো আজ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

বিকেলে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। অথচ পুজোর বাজারে একটুও ভিড় কমেনি। পেঁজা তুলোর মত ভাসমান মেঘগুলি সবার অজান্তে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মাঝেমাঝে তাদের বিদ্রোহের বিদ্যুতও ঝলকানি দিচ্ছে আকাশে।

— "কি সমরেশ বাবু, অপিস গিয়েছিলেন বুঝি?"

— আকস্মিকতায় সমরেশ চমকে ওঠে। সে সামনে তাকায়।

— 'আরে ব্যানার্জীদা, আপনি কতক্ষণ?' — সমরেশ প্রশ্ন করে।

— 'এই তো, এইমাত্র; তা বলি, বাড়িতে সব ভালো তো?'

— 'ঐ আর কি।' সমরেশ বলে।

— 'সামনে তো পুজো, কিছু ভাবলেন নাকি? যাবেন-টাবেন কোথাও? আসুন না একদিন অপিসে।'

— 'দেখি।' চুপ করে থাকে।

ব্যানার্জীদা চৌধুরী ট্রাভেলসের ম্যানেজার। বছর পাঁচেক আগে এদের সঙ্গে সমরেশ ও শীলা দার্জিলিং গিয়েছিল। কি মজাটাই না হয়েছিল তখন। দৈনন্দিন জীবনের শারীরিক ও মানসিক বাঁধাধরা গণ্ডী পেরিয়ে ওরা শপথ নিয়েছিল নতুন জীবনের। খুঁজে পেয়েছিল এক অদ্ভুত অনাস্বাদিত আনন্দকে। আর দার্জিলিং — যেন সেই খুঁজে পাওয়ারই প্রতীক।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বাসের জানলা দিয়ে আসা বৃষ্টির ছাট কখন যেন সমরেশের পিঠের জামা ভিজিয়ে দিয়েছে। সে জানালাটা তুলে দিল। বাইরের দৃষ্টি ভিতরেই আবদ্ধ হয়ে পড়ল। জানালার সবুজ কাঁচটা দিয়ে বাইরের আয়তাকার ছোট্ট জগৎটাকে কেমন যেন অসাধারণ সবুজ দেখাচ্ছে। হয়তো এই সবুজই সজীবতার প্রতীক। সমরেশের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কত আবছা সুখস্মৃতি মনে জেগে ওঠে তার। তারই আস্বাদনে তৃষ্ণার্ত জীবন তৃপ্ত হয়। তৃপ্তির অহংকারে সে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট ভুলে যেতে চায়।

কন্ডাক্টরের চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে আসে তার। গন্তব্য এসে গেছে। পুজোর আঁচ এখনো এখানকার সদ্য গজানো দোকানগুলিকে স্পর্শ করেনি। এই রাস্তায় জামা কাপড়ের দোকানগুলিতে তেমন ভিড় নেই। রাস্তাঘাটও বেশ ফাঁকা। তিরিশ-চল্লিশ মিনিট অন্তর দু-একটা বাস আসে বটে, নয়তো এদিককার মানুষের প্রধান ভরসা সেই রিকশা নইলে ইদানীং অটো। তরুণ সংঘের পাশ দিয়ে বাঁ দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, সেখান দিয়ে সোজা মিনিট পনেরো হাঁটলেই সমরেশের বাড়ি। পাড়ার ছেলেগুলি আজ আর চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে না। হয়তো ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে। মাঠের পাশে বুড়ো বটের তলায় কয়েকটা ষাঁড় শুয়ে আছে। দূরদর্শনের সংবাদ পাশের বাড়ির কৃপাধন্যে রাস্তায় পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সমরেশের বাড়ি এই সময়ে অন্ধকার।

দরজা ঠেলে সমরেশ ভেতরে ঢোকে। ডানদিকের সুইচ বোর্ডে চাপ দিতেই টিউবটা কট্‌কট্‌ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু চমকে ওঠে সে। শীলা হাতখানেক দূরে চৌকির উপর বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

— 'কি হয়েছে?' সমরেশ প্রশ্ন করে।

— 'মা... মা...', শীলা আবার কেঁদে ওঠে।

— 'কি? মার কি হয়েছে?'

— 'হাসপাতালে। হঠাৎ নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই অ্যাম্বুলেন্সে করে সবাই ...' শীলা আর বলতে পারে না।

— 'সেকি। তুমি আমাকে একটা ফোন করোনি কেন?'

— 'তুমি ছিলে না।'

পঞ্চম ভাগ

সমরেশের মা গত হয়েছেন। আজ তিনদিন হয়ে গেল। রোগটা এমনই। কোন সময়ই ছিল না। সকালে যাকে ভাল দেখে অপিসে গিয়েছিল, রাত্রে তার এই অবস্থা হবে কে ভেবেছিল। সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করা গেল না। গৌরবের থেকে পাওয়া টাকাগুলি দিয়ে হয়তো চিকিৎসাটুকু করা যেত, কিন্তু নিয়তি তাতে বাদ সাধল। অর্থহীনভাবে টাকাটা এখনও পড়ে আছে শোকেসের ড্রয়ারে। শরতের শিউলি ফোটার আগেই এভাবে শীতের পাতা ঝরা কাল এসে গেল। শুষ্ক ধূসর জীবনে এই আঘাতটা হয়তো সমরেশ বেশি করে অনুভব করবে। বাবা যখন মারা যান তখন মার স্নেহে, ভাইবোনের ভালবাসায় তার বেদনা অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরপর সমরেশ সেই মাকে আঁকড়ে ধরে বেড়ে উঠেছিল — গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই অবলম্বনটুকুও বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেল। সমরেশের জন্য আর কেউ রইল না; সমরেশ রয়ে গেল অপুর জন্য, শীলার জন্য।

এইভাবেই শ্রাদ্ধ-শান্তিও কোনরকমে মিটে গেল। দৈনন্দিন জীবনে অনেক অভাব হওয়া সত্ত্বেও সে গৌরবের দেওয়া টাকায় হাত দেয়নি। তা সত্ত্বেও কোনদিন কারও কাছে নিজের দারিদ্রের বহিঃপ্রকাশও করেনি। ভারাক্রান্ত সমরেশকে অনেকে উপদেশ দেয় কোথাও ঘুরে আসার। সমরেশ সবার অলক্ষ্যে হাসে। পুজোতে ছেলেকে যৎসামান্য কিছু দিতে পারলেও, শীলাকে কিছুই দিতে পারল না সে। অথচ ড্রয়ারে যে টাকার পাশে মাকড়সা তার জাল বুনছে, সমরেশ তার সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের জাল ছিঁড়ে ফেলে টাকাটা কিন্তু নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে না। দারিদ্রের ভারে ঝুঁকে পড়া জীবনে সে ঐ কাগজের নিরর্থক টাকাগুলিকে আঁকড়ে ধরে অবলম্বন করতে চায় না।

আজ ২রা ডিসেম্বর। আজ থেকে এগারো বছর আগে সমরেশ ও শীলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওরা দুজনেই ভুলে গেছে দিনটার কথা। বাসে তেমন ভিড় নেই। বৃদ্ধ ভিখারিটি আজ এক নতুন গান ধরেছে। সে বলে — এটা নাকি জীবনমুখী। ফুটপাতের লোকগুলি কেমন অদ্ভুত গতিতে ছুটে চলেছে। কারোরই আনন্দ বা বিষাদের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। যান্ত্রিক গতিজাড্য মানুষকে যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছে। এখানে আবেগ-অনুভূতির কোন স্থান নেই।

'বাবু, কিছু দিবেন? ছেলেটার যে বড্ড অসুখ বাবু।' — ভিখারিটি তার কালো রেখাঙ্কিত হাতটি সমরেশের দিকে মেলে ধরে।

সমরেশ প্রশ্ন করে — 'কি হয়েছে ছেলের?'

— 'ক্যানসার, রক্তে।'

— 'ক্যানসার!!' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সমরেশ বলে, — 'কোথায় থাক?'

— 'আজ্ঞে বাবু, ফাঁড়ী, রেলবিরিজের তলায়।'

— 'কি নাম তোমার?'

— 'আজ্ঞে বিশু, লোকে তো তাই বলে, শুনেছি, আসল নাম বিশ্বনাথ সাউ।'

বাস জ্যামে আটকে গেছে। বিশু তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে গিয়ে অন্য বাসে তার জীবনমুখী গান শুরু করেছে। সমরেশ তাকে ডাকতে যায়; কিন্তু জ্যাম খুলে গেছে, বাস ছুটে চলেছে।

অপিসে আগের মত কাজকর্ম ইদানীং আর হচ্ছে না। লোক আসে—বসে—চলে যায়। কাজ বলতে আর তেমন কিছু নেই। অনেকে আবার বলছে অপিসটা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। নয়তো লোক ছাঁটাই হবে। মালিক তার ব্যবসাপত্র গুটিয়ে তার দেশে চলে যাবে। এখানে আর তেমন শিল্প-টিল্প জমছে না। ছাঁটাইয়ের উত্তাপে এই দু হাজার স্কোয়ার ফিটের সামান্য অপিসটাকেও ছাড়েনি। দীর্ঘ দশ-বারো বছর ধরে যে সব কর্মচারী পরিশ্রম করেছে, তা বর্তমানে অর্থহীন হয়ে পড়বে। জীবন এগিয়ে চলবে এক অজানা-অচেনা অন্ধকার ভবিষ্যতের পথ ধরে। অথচ এই বিপদের মুখে কোন নেতারা প্রতিবাদ করল না। এমনকি একটাও পোস্টারও পড়ল না। কিন্তু কেন? কেন এমন হয়? সমরেশের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

টিফিন আওয়ার্সে সে গৌরবের অপিসে যায়। সেখানে আর আগের মত ওয়ার্ক কালচারিস্টদের ভাষণ হচ্ছে না। অপিসটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গৌরবের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ায় সে। দরজায় নেমপ্লেট পরিবর্তন হয়েছে। তাতে বড় করে লেখা রয়েছে — অশোক রাউত, জেনারেল ম্যানেজার।

— 'গৌরব নেই?' — সমরেশ বাইরে আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করে।

— 'স্যার দিন পনেরো হল মহারাষ্ট্রে বদলি হয়েছেন।'

— 'মহারাষ্ট্র!!' — সমরেশ ধীরে ধীরে নীচে নেমে যায়।

সেদিন রাস্তায় যেখানে গণ্ডগোল হচ্ছিল; সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে সুন্দর ফুলের মালা বিক্রি করছে। আরে আজ ২রা ডিসেম্বর না। আজ তো সমরেশের বিবাহবার্ষিকী। সব মনে পড়ে যায় তার। ঘুণে খাওয়া, জং পড়া মনের পর্দায় সব স্মৃতিরেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ ভাগ

ফুলগুলি সত্যিই খুব ভাল। সমরেশের হাতে শালপাতায় মোড়া ঐ মালার থেকে এক মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। যা মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলেছে আনন্দে, সমরেশ যেন নতুন জীবন সন্ধান পেয়েছে। সে শীলাকে বলে, — 'আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী না? মনে আছে তোমার?'

— 'হ্যাঁ মনে আছে'। শীলার কোটরগত চোখ দুটি চিক্ চিক্ করে ওঠে।

— 'কিন্তু শীলা আমি তো তোমার জন্যে কিছু আনতে পারিনি। এই মালা ছাড়া।' সমরেশ বলে।

— 'তাতে কি হয়েছে।'

— 'দাঁড়াও।' সমরেশ শোকেসের ড্রয়ার খোলে।

ধূলিজীর্ণ টাকাগুলিকে সে খামে পুরে দরজার দিকে এগিয়ে চলে।

শীলা বলে, — 'কোথায় চললে তুমি?'

— 'আসছি।'

রাত্রি আটটা। রেলব্রিজের তলায় খুব হৈ হুল্লোড় হচ্ছে। একের পর এক দাঁড়িয়ে থাকা অবৈধ বেড়ার ঘরগুলি যেন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করছে। সর্বহারার দেশে যারা নিজেদের সর্বস্ব খুইয়েছে, এই ঝুপড়িগুলি যেন তাদেরই আশ্রয়। একদল লোক খালি গায়ে ছুটে আসছে সামনে, কার যেন ছেলের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ হয়েছে, তাকে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। সমরেশ ঐ ভিড়ের দিকে এগিয়ে চলে। জটলা ঠেলে একটু সামনে যেতেই, সে সেই ভিখিরিটিকেই দেখতে পায় — বিশু, বিশ্বনাথ সাউ। তার পাশে শুয়ে আছে তার ছেলে। হাপরের মত লাফাচ্ছে তার শীর্ণ বুকখানি। আধবোজা চোখে তার অদ্ভুত নিস্পৃহতা।

— 'বিশ্বনাথ।' বিশ্বনাথ মুখ তুলে সমরেশের দিকে চেয়ে থাকে।

ঐ নামে কেউ তাকে কখনো ডাকেনি।

— 'চিনতে পারছ আমাকে?' সমরেশ প্রশ্ন করে।

— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবু, আজকে বাসে ...।' বিশুর গলা কেঁপে ওঠে।

— 'বিশ্বনাথ, তখন তোমায় কিছুই দেওয়া হয়নি তাই দিতে এলাম।' বিশু কিছু না বলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সাদা খামটা সমরেশ বিশুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে। তোমার ছেলের জন্য।' বিশু কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

— 'আহা, এ কি করছ, ওঠো এখন।' সমরেশ ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ভীষণ হালকা লাগছে সমরেশের। একটা ট্রেন স্টেশনে না দাঁড়িয়েই সোজা ছুটে চলে গেল। সারা মন জুড়ে আজ এখন শুধু আনন্দ। বিবাহ বার্ষিকীতে নাই বা হোক উপহার — মনের আনন্দই উপজীব্য। সে আজ গৌরবের ঋণ শোধ করতে পেরেছে। এখন আর আকাশে মেঘ নেই; তারা উঠেছে; উঠেছে এক ফালি চাঁদও।

বাড়ি ফিরে সমরেশ শীলাকে বলে, 'চলো না, ঐ বটগাছটার তলায়, কিছুক্ষণ বসি। আজকে খুব ভালো লাগছে।' কখন যেন অপুও পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার মায়ের হাত ধরেছে। সে বলে ওঠে, — 'আমিও যাব।' □

সুশান্ত পাল
প্রথম বর্ষ, পদার্থ বিজ্ঞান

ফেরা

দীনবন্ধু চৌধুরীর অনেক দিনের অভ্যাস ভোরবেলা মর্নিংওয়াক করতে বেরোনো। যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তবু তিনি তার এই অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। ভোর সাড়ে চারটে বাজলেই তিনি তাঁর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন প্রাতঃভ্রমণে। এমনই এক ভোরবেলা তিনি বেরিয়েছেন। পুকুরপাড়ের পাশ দিয়ে, কোনরকমে জঞ্জালে পা না মাড়িয়ে সাবধানে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময়ে সামনে দেখলেন হরিপদ ঘোষ এগিয়ে আসছে। এই হরিপদর পরিচয়টা দেওয়া দরকার। হরিপদ হল এ পাড়ার ভারী, অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি জল তুলে দেয়। তিনকূলে এর কেউ নেই। পাড়ার এককোনে এক টিনের ঘরে থাকে, আর প্রত্যেকবাড়িতে জল তুলে দিয়ে কিছু সামান্য টাকা রোজগার করে। ওতেই ওর চলে যায়। তবে লোকটা বেশ হাসিখুশি।

দেখতে দেখতে লোকটা খুব কাছে এগিয়ে আসে। চৌধুরীমশাই ভাল করে চেয়ে দেখলেন যে এ তো একেবারে অন্য হরিপদ। কোথায় তার ফাটাজামা, আটহাতি ধুতি, ছেঁড়া চটি? এ যে একেবারে কার্তিক ঠাকুর! গায়ে ধবধবে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। ধুতির কোঁচাটা আবার পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা। তার উপর আবার একটা গোলাপ ফুলও গোঁজা হয়েছে বুকেতে! যিনি দর্শক, তিনি তো তাজ্জব।

— 'আরে হরিপদ নাকি হে?'

— 'আজ্ঞে, নমস্কার চৌধুরীমশাই।'

চৌধুরীমশাই কৌতুকের স্বরে বলে ওঠেন, 'তা, এত সকালবেলা এরকম সেজেগুজে কোথায় চললে? যতদূর জানি তোমার কোন শ্বশুরবাড়ি নেই। তা, নতুন কোন কুটুমবাড়ি হল নাকি?'

হরিপদ সলাজে বলে ওঠে, 'কি যে বলেন, বাবু? আমি চলেছি এক বিশেষ কাজে।'

'তোমার সেই বিশেষ কাজটা কি?'

হরিপদ খানিক চুপ করে থাকে, যেন সে নিজের কথা কাউকে বলতে চায় না।

'আহা, বলই না! তুমি তো আমাকে চেন, আমি কাউকে বলব না।'

হরিপদ বলে ওঠে, 'আজ্ঞে, আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। ভোরের দিকে ঐ শীতলা মন্দিরের পাশে ঘাটে কেউ থাকে না বলে এই সময়টাকেই বেছে নিলাম।'

দীনবন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হরিপদর দিকে। খানিকবাদে হেসে ওঠেন!

'তা আত্মহত্যাই যদি করবে তবে এত সাজগোজ করেছ কেন বাপু? আর এতো টাকাই বা পেলে কোথায়?'

হরিপদও হেসে বলে, 'অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়ে আসছি এই সব নতুন নতুন কাপড়জামা কিনব বলে। কি জানি মরার পর কোথায় যাবো? নতুন দেশের নতুন মানুষ। প্রথমেই যদি আমায় নোংরা দেখে তখন তারা আমায় কি ভাববে বলুন তো? তাই একটু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছি।' — পরক্ষণেই সে বলে ওঠে, 'আপনার সাথে কথা বলতে বলতে অনেক দেরী হয়ে গেল! আচ্ছা, আমি চলি।'

দীনবন্ধু ভাবলেন ছেলেটা পাগল হয়ে গেল নাকি! তিনি চট করে তাকে থামিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ গো হরি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এসব তোমার মাথায় কে চাপালো?'

হরিপদ বলে, 'আমার চল্লিশ বছর বয়স হলো। জীবনের অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম। এ পৃথিবীকে আমার আর কিছুই দেবার নেই। এরপর তো সেই বৃদ্ধ বয়সকাল আসবে। রোগেভোগে শরীর ক্লান্ত হবে। তার চেয়ে নিজেই ধরা দিয়ে দেব।'

বৃদ্ধ দীনবন্ধুর ঠোঁট কেঁপে উঠল। চোখ দুটো নিজের অজান্তেই ভিজে গেল। মন চলে গেল কৃষ্ণচূড়াগাছের পাশ দিয়ে দূরে ঐ পথটার একেবারে শেষসীমানায়, যেখানে আকাশ আর মাটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মনের ভিতরের একরাশ জমানো ব্যথা যেন চিৎকার করে উঠছে মুক্তির জন্য। চল্লিশ বছরের এই নগণ্য ছেলেটা কত সহজে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে অথচ আশি বছরের এক নির্বিষ বৃদ্ধ ছেলে বউয়ের চোখ রাঙানি সহ্য করে এখনো বেঁচে আছে!

দীনবন্ধী হঠাৎ বলে ওঠেন, 'হরিপদ, তুমি আমায় সঙ্গে নেবে? তোমার মতো হয়তো আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি কিন্তু আজ তোমার এই মহৎ ভাবনা আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। লক্ষ্মীটি, আমায় তোমার সঙ্গে নাও।' — এই বলে তিনি হরিপদর দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরেন।

হরিপদ পড়ল মহাসমস্যায়। বেশ সে চলছিল নিজের চিন্তায়, উপর থেকে ঘাড়ে এল এই আপদ! বুড়োমানুষ, গালাগাল করে তাড়াতে পারে না আবার সঙ্গে নিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চায় না। ঝুলেপড়া মুখের চামড়ায় ক্লান্তির ছাপ, চোখটাও ভালো করে তাকাতে পারছে না। মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ মায়া হল হরিপদর। সে বলল, 'চলুন তবে। কিন্তু

এই পোষাকে? এই নোংরা পোষাকে?' —

বৃদ্ধ বলে ওঠেন, 'ও কিছু হবে না। আমি যমদুতের হাতে নয় কিছু টাকা গুঁজে দেব। ইহলোক কি পরলোক, টাকায় সবাই কাত। চলো, চলো, আর দেরী করা ঠিক হবে না।' —

এই বলে দুজন দ্রুত পদক্ষেপে ঘাটের দিকে এগিয়ে চললেন। পথে কেউ কারোর সাথে কথা বললেন না। দুজনের মনেই উত্তেজনা। হরিপদর মনে শুধু নতুন জগৎ ও নতুন মানুষ দেখার আগ্রহ আর দীনবন্ধুর মনে একটাই চিন্তা, তিনি কি ঠিক করছেন? পরক্ষণেই মনে হয় আর নয়, অনেক হলো, এবার জীবনের একটা শেষ হওয়া দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘাটে এসে পৌঁছলেন। সকাল পাঁচটা। শীতের সকাল। বিশেষ লোকজন নেই। তখনও নদীতে জোয়ার আসে নি। জল অনেক দূরে। ঘাটের সিঁড়ি থেকে নদীর জল পর্যন্ত কাদায় কাদা। হরিপদ বৃদ্ধকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। কিন্তু চৌধুরী মশাই আর যেন পারছেন না। কাদায় তারপা বসে যাচ্ছে, বুকের মধ্যে হৃদস্পন্দনের শব্দ যেন তিনি নিজে কানে শুনতে পাচ্ছেন। কাদায় হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি যখন এগিয়ে চলেছেন তখন হঠাৎ ঐ পাঁকের মধ্যে কি যেন একটা চকচকে জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। তিনি কিছুটা আগ্রহের বশেই জিনিসটা হাতে তুলে নিলেন। সর্বাঙ্গে কাদা লেগে আছে, কিন্তু তার মধ্যেও বস্তুটির জৌলুস এতটুকু কমেনি। অভিজ্ঞ বৃদ্ধ হাতে নিয়েই বুঝতে পারলেন যে এটি একটি সোনার সীতাহার তাতে মাঝে মাঝে একটি করে লাল পান্নার পাথর বসানো। আর একটু হাতড়াতেই কিছুদূরে দুটি কানের ঝুমকো পেয়ে গেলেন। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে। গলার স্বর বুজে আসছে, শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন একটা শীতল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে চার বছরের নাতনীর মুখটা ভেসে উঠল। গতকাল রাতে সে বায়না করেছিল। ততক্ষণে হরিপদ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠে,

'এই জন্য আপনাকে আনতে চাইছিলাম না, নিজেও মরবেন না, আর আমাকেও মরতে দেবেন না।

চলুন, চলুন, এরপর ভিড় হয়ে গেলে আর পারবেন না। তখন সব জল্পনা কল্পনা ভেস্তে যাবে।' —

'আরে, দেখ, দেখ, হরিপদ, আমার হাতে কি?

এ জিনিস কোন দিন দেখতে পাবে না। কম করে চল্লিশ হাজার টাকা দাম হবে সব মিলিয়ে।' —

'চল্লিশ হাজার টাকা! সে তো অনেক টাকা। এতো টাকা নিয়ে কী করব।' —

'আরে দুজনে ভাগ করে নেব। বুঝলে হরিপদ, কাল থেকেই মনটা খচখচ করছে, নাতনীর বায়নাটা রাখতে পারলুম না। এবার মনে হয় পারব।' —

হরিপদ বলে, 'আচ্ছা চৌধুরীমশাই, এই টাকায় একটা টি.ভি. কেনা যাবে? পাশের বাড়ির পাঁচু টি.ভি.-তে কেমন নাচ গান দেখে! তাহলে, আমিও দেখতে পারবো?' —

'কী যে বলো, টি.ভি. কেন? তোমার ঘরের পুরো চেহারাটাই বদলে যাবে।' —

'তাহলে, আত্মহত্যা? এত কষ্ট করে যে সেজেগুজে এলাম!'

বৃদ্ধ ধমকে ওঠেন, 'আরে, রাখো তোমার আত্মহত্যা, ওকি পুরুষে করে! ও তো কাপুরুষের কাজ, এরপর তো আমরা আবার সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবো।' —

'তবে চলুন চৌধুরীমশাই, আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের পুরনো সংসারে।' —

এই বলে ওরা দুজন আবার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে।

তার কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ওঠে। নতুন সূর্য তার আলোতে সমস্ত আকাশ ভাসিয়ে দেয়। শীতলামন্দিরের পাশের ঘাটে তখন লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য মানুষের কোলাহলে ঘাট পুরো কলরিত। এই গল্পের দুই চরিত্রকে আর দেখা যাচ্ছে না। তারা মিলিয়ে গেছে, তারা হারিয়ে গেছে, ঐ অগণিত অসংখ্য দুপেয়ে জন্তুদের ভিড়ে। □

শ্রী রাকেশ মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরাজী (অনার্স)

দাড়ি নিয়ে কেলেঙ্কারি

আজ অনেকদিন পর এই লেখা লিখতে আমার কলম সরছে না। যখনই লিখতে বসি তখনই মনে পড়ে আমার সেই নিহত প্রাণাধিক প্রিয় আদরের বন্ধুর কথা, যার জন্য সবাই একদিন আমাকে মনে রাখবে। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়, আমার চিবুকের নিচের অল্প ক-গাছা নির্দোষ-নিষ্পাপ সরল-সাদাসিধে 'দাড়ি'।

এই দাড়ির সাথে আমার পরিচয় ঘটে কিছুদিন (মানে কয়েক বৎসর, কিন্তু প্রিয়তমার সাথে মিলনের ক্ষেত্রে কয়েকদিনই বটে) আগে ছবিতে দেখা আব্রাহাম লিঙ্কনের 'দাড়ি' দেখে। দেখেই সত্যি বলতে কি, প্রেমে পড়ে যাই। রাত্রে স্বপ্ন দেখি মিঃ লিঙ্কন আমাকে তাঁর দাড়ি উপহার দিচ্ছেন। গোটা আমেরিকা উত্তাল। ঘুম থেকে উঠে দাড়ি না পেয়ে সে কি মন খারাপ, মনে মনে ঠিক করি, জীবনে আর কিছু না হোক — ক-গাছা দাড়ি আমি রাখবোই, রাখবো। যাই হোক, সেদিন থেকে আমি গোটা মুখ কামাই, চিবুকের নিচের তিন বাই চার সেমি জায়গা বাদ দিয়ে। কয়েকদিন এরকম করার পর একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি চিবুকের নিচে নতুন চারগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ওঃ, সে ক আনন্দ! আর কয়েকদিন পরেই কলেজ খুলবে। বন্ধুদের সামনে এবার বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো, 'দেখ আমার সাথে কে এসেছে?, কিন্তু বাড়িতে ও জিনিস তেমন গ্রো করলো না। তা সত্ত্বেও, আমার পিতৃদেব হঠাৎই একদিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পিলে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'তোর থুতনির নিচে ওটা কি?' একেই বলে জগতে সরলের স্থান নেই। চুরি নয়, ডাকাতি নয়, তার জন্য এত ধমক। আমতা আমতা করে বলি, 'না মানে ইয়ে ...'। 'গিয়েই কেটে ফেলবে, যত সব ফকেটিয়াগিরি।' হ্যাঁ, বললেই হল, আর নিজের মাথায় মরুভূমির চারপাশে যে মরুদ্যান তা বুঝি খুব ভাল। নেহাৎই দুদিন পর এমনিতেই চলে আসতে হত, না হলে রাগ করে আমি চলেই আসতাম।

প্রথম ক্লাসের দিন আমার দাড়ি পূর্ণতা পেয়ে গেল। এখন দূর থেকে আমাকে যে কেউ দেখলেই আমার চিবুকের নিচের ঘন কালো বস্তুটিতে দেখতে পাবে। কিন্তু এরপর যে ধুন্ধুমার কাণ্ডটা ঘটল তা নিয়েই আমার গল্প। প্রথম দিন কিঞ্চিৎ লজ্জাবশতঃ হোস্টেলের অন্ধকার মত জায়গাই বেছে নিলাম। তা সত্ত্বেও এক বন্ধু দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এরকম রামছাগলের মত দাড়ি রাখতে গেলে কেন বাবা?' মনে মনে বললাম, "তোরবাপের পয়সায় রাখিননি।" মুখে বললাম, 'কোন আইন আছে নাকি গোঁফ কেটে দাড়ি রাখা চলবে না।' কিন্তু তারপরে ক্লাসে উপস্থিত হতেই সবকটা মুখ একসাথে আমার দিকে ঘুরে গেল। প্রথমে বুঝতে না পেরে গর্বে বুক ভরে গেলেও পরক্ষণেই যে হাসির ফোয়ারা উঠল, তাতে চমকে গেলাম। এ কি রে বাবা! আমি কি দাড়ির সাথে লাফিং গ্যাস ফিট করে নিয়ে এসেছি নাকি? কয়েকটা হতচ্ছাড়া এগিয়ে এলো। এদিকে আমিও মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, 'পরিস্থিতির কাছে মাথা নোয়াব না। দাড়ি আমি কাটব না।' কিন্তু মুসকিল হল টিচারদের নিয়ে। ক্লাসে ঢোকার আগে একবার আর বেরনোর সময় একবার, আমার দাড়ির দিকে তাকানো চাই। কেন বাবা? দাড়ি কি আপনাদের ডিগ্রি করে নিচ্ছে নাকি? একদিন তো এক টিচার আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য নাম ভুলে গিয়ে ডাকলেন, 'দাড়ি শোন তো।'

কয়েকদিন পর দেখলাম ডিপার্টমেন্টে দুটি দল গঠিত হয়েছে — দাড়ির স্বপক্ষে, দাড়ির বিপক্ষে। যেখানেই যাই, আলোচনার বিষয় 'দাড়ি'। দুর্ভাগ্যবশতঃ দাড়ির সাপোর্টার খুবই কম পেলাম। কোন মহিলা সদস্যা তো নেই-ই 'দাড়ি পার্টি'-তে। কিন্তু একদিন ডিপার্টমেন্টাল হেড বললেন, 'তোমার অসুখ নাকি? দাড়ি রেখেছ দেখছি।' তখন কোন মতে 'ফোড়া হয়েছে' বলে পাড় হয়ে গেলেও মনে সন্দেহ জাগল, 'তবে কি লোকে মরবার সময় দাড়ি রেখে মরে নাকি?' কিন্তু ততদিনে আমার দাড়ির সাথে প্রেম বেশ গাঢ় হয়েছে। যেখানেই যাই, আমি আর দাড়ি। অন্ধকার নির্জন শালবনের রোমান্টিক পরিবেশে আমি বসে আছি সাথে দাড়ি। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, রাষ্ট্রসংঘের সভা হচ্ছে। জর্জ ডব্লিউ বুশ ভাষণে বলছেন, 'একমাত্র দাড়িই পারে বিশ্বশান্তি ও সৌহার্দ্যতা বজায় রাখতে।'

তদুপরি এই দাড়ির জন্যই আমাকে এক ঘরে হতে হল। ডিপার্টমেন্টে গেলেই জনগণ চার হাত দূরে ছিটকে যায়, যেন কোন কুখ্যাত আসামী তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। নতুন একটা কথাও কানে এল, 'ডিপার্টমেন্টকে নাকি দাড়ি মুক্ত করতে হবে।' বাজারে গেলে দোকানদার বেশী দাম চেয়ে বসে, যেন দাড়ির উপর ট্যাক্স বসাচ্ছে। রাগের চোটে ভাবলাম যাই দিদির ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। আর যাই হোক, দিদি নিশ্চয় ভাইকে ভুল বুঝবে না। কিন্তু এখানে আসার পরই আমার দাড়ির জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এলো। যেই না দিদির ঘরে পা রাখা অমনই কানফাটা আওয়াজ, 'তুই দাড়ি রেখেছিস ছাগলের মত!' মেয়েদের গলার স্বর যে অমন বাজখাঁই হতে পারে তা জীবনে প্রথম শুনলাম। বললাম, 'কেন কী হয়েছে?' — 'কী হয়েছে? হতচ্ছাড়া ছিঃ, লোফার — লোফার লাগছে একেবারে।' যে দিদি কিনা আমি গেলেই সেরা সেরা রান্না করে খাওয়াত, সেই দিদি রাত্রে দিল কিনা পটলের তরকারি, পেঁপে সিদ্ধ আর ভাত। যেন আমি আমাশয়ের রুগী, ইতিহাস বলে — পৃথিবীতে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার প্রধান কারণ হল, মানুষের খাদ্যদ্রব্যের টান, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। এবার দাড়ির উপর আমার রাগ জন্মাতে লাগল। 'হতচ্ছাড়া দাড়ি, মনে হয় টান মেরে ছিঁড়ি।' সেখানে রেজার নেই তাই দাড়ির ফাঁসি হল না। এখানে ফিরে দু-মিনিটের মধ্যে রেজারের দুটানে ওটার বলি দিলাম।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই একটি জার্নালে চোখ গেল, দেখলাম — 'আব্রাহাম লিঙ্কনের শান্ত গভীর চোখ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ দাড়ির জন্য তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।' এবার আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসল। যতই হোক, দাড়ি তো আমার অন্যায় কিছু করেনি। বরং তার পিছনেই সারা বিশ্ব লেগেছিল। বন্ধুগণ ১০ই জুলাই, ২০০১ আমার দাড়ির মৃত্যু দিবস। তোমরা কেউ পালন করতে চাও তো করো। তবে, আমিও বলছি তোমাদের — 'আবার আসিব ফিরে; তোমাদের মাঝে যখন আমার চিবুকের নিচে জ্বলজ্বল করবে চার ইঞ্চি লম্বা 'দাড়ি'। ■

সিরাজ-উদ্-দৌলা
ইংরেজী বিভাগ — ১ম বর্ষ

মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে সমাজের ক্রমবিবর্তন

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসচর্চা বেশ বর্ণময়। আর এই ইতিহাসের অনুপুঙ্খ পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট পার্থক্যটুকু সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কার্ল মার্কস-ই প্রথম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এর মাধ্যমে সেই ধারাগুলিকে স্পষ্টভাবে পৃথক করেন। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফলে ঘটে যাওয়া সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার পূর্বে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি তা জানা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)—'Historical Materialism gives an insight into the objective logic of development by showing the laws governing the development of material production and establishing the dependence ion it of all the other elements of social life' (V. Kelle and M. Kovalson)

যুগে যুগে ঘটেযাওয়া চর্চায় সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির মধ্যে শ্রেণী সংঘাত একটি অনিবার্য বিষয়। আর এই বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলেই ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে নবতর পৃথিবীর রূপ লাভ করেছে। সমাজের এই পরিবর্তন ও অগ্রগতির মূলে যে শক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সেটিই 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' তত্ত্ব নামে খ্যাত।

মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে উৎপাদন পদ্ধতিই (mode of production) হল সবকিছুর মূল কথা। কোন নির্দিষ্ট সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে ওঠে উৎপাদন শক্তি (Productive force) এবং উৎপাদন সম্পর্কের (Production relation) ওপর। এবারে দেখা যাক উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক কি?

উৎপাদন শক্তি — শ্রমিক, শ্রমশক্তি ও যন্ত্রপাতির যোগফল।

উৎপাদন সম্পর্ক — উৎপাদন কাজকর্মের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কই হল উৎপাদন সম্পর্ক।

এই সম্পর্ককে পাঁচটি রূপে ইতাহাসে দেখা যায়।

১) আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা (Primitive Communal Society)
২) দাস সমাজব্যবস্থা (The Slave Society)
৩) সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (The Feudal Society)
৪) ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (The Capitalist Society)
৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (The Socialist Society)

প্রসঙ্গত বলা দরকার; প্রথম ও শেষ সমাজব্যবস্থা কোন শ্রেণী বৈষম্য নেই। কিন্তু মধ্যবর্তী পর্যায়ের সমাজব্যবস্থাগুলিতে শ্রেণী বৈষম্য থাকে যা জন্ম দেয় শ্রেণী সংগ্রামের।

আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা (The Primitive Society)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের দলবেঁধে বাস করত। দলবেঁধে আত্মরক্ষা করত। সমবেতভাবে শিকার করে আহৃত খাদ্যবস্তু সমবণ্টন করত। ফলে এই সমাজে কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। শ্রেণীহীন, শোষণহীন এই সমাজে মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক।

এই সমাজব্যবস্থায় সমগ্র সমাজই ছিল উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিক। তখনকার উৎপাদন শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে এই উৎপাদন সর্ম্পক ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সময় উৎপাদনের উপকরণের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না।

* ক্রমে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছোট ছোট নানান গোষ্ঠীতে ভাগ হল।
* সমষ্টিগত শ্রমের প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে ভাষার উদ্ভব হয়।
* নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে পশুপূজার সূচনা, পশুপূজা থেকে ধর্মের উৎপত্তি।
* উন্নত যন্ত্রপাতির উদ্ভব, কৃষি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, পশুপালনে উন্নতি, ধাতুর আবিষ্কারের পথ ধরে গোষ্ঠীগুলো আরো অনেকগুলো গোষ্ঠীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে tribe-এর সৃষ্টি করে।
* প্রথমে দ্রব্যাদি ও পরে মুদ্রা বিনিময়ের সূচনা হয়।
* নিজস্ব চাহিদার বেশী উৎপাদনের ফলে বাড়তি উৎপাদনের উদ্ভব।
* বাড়তি উৎপাদনের ফলে সমবণ্টন প্রথা বদলাতে থাকল — পরিবর্তে বেশী উৎপাদনকারী বেশী পেল।
* ক্রমে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তি হয়।
* আদিম সমাজব্যবস্থার একেবারে শেষের দিকে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয়।

দাস সমাজব্যবস্থা (The Slave Society)

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের একটি বিশেষ অংশ দাস সমাজব্যবস্থা। ইতিপূর্বে যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের মেরে ফেলা হত। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে দাস ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটল। ক্রমে দাসরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হল। এই সময়ে সমাজে অবাধ ভাবে দাস কেনা-বেচা চলত। দাস মালিকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাসদের দিয়ে পশুর মতো খাটাত। দাস, শ্রম-সম্পদ বৃদ্ধির উৎস হয়ে দাঁড়াল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, গ্রীসে প্রথম দাস ব্যবস্থার সূচনা হয়। দাস ব্যবস্থা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বলেছেন ঃ "ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত সম্পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন ও অধিকারবিহীন এবং তাদের মধ্যে কঠিন শ্রেণীদ্বন্দ্ব — এই হল দাস ব্যবস্থার চিত্র।" দাসদের ওপর পাশবিক অত্যাচারের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি স্থায়ী যন্ত্রের। এই স্থায়ী যন্ত্রটি হল রাষ্ট্র, যা এই সময় ক্রমশ সংগঠিত হয়।

দাস সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী শোষণের সূচনা। এই ব্যবস্থায় দাস মালিকরাই ছিল উৎপাদনের উপকরণ ও দাসদের মালিক। আর দাসরা ছিল অবহেলিত, বঞ্চিত। দাস মালিকদের অত্যাচার প্রতিহত করতে না পেরে তাদের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে এবং একদিন তার স্ফূরণ ঘটে। তবে দাস ব্যবস্থার অবসানের কারণ শুধু দাস বিদ্রোহ নয় তার সঙ্গে জড়িত বহিঃদেশীয় আক্রমণ ও সমাজের ভাঙা-গড়া।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (The Feudal Society)

উদ্যোগবিহীন ক্রীতদাসদের তুলনায় ভূমিদাসদের সঙ্গে কারবার করাই সামন্ত প্রভুরা বেশী পছন্দ করল। যেসব দেনাদার কৃষক প্রতিবছর মনিবকে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দিত ভূমিদাসরাও তাদের খণ্ড খণ্ড জমি দিত। এই সব কলোনরা জমির সঙ্গে এমনভাবে আটকা পড়ে, যাতে জমি বিক্রী হলে কলোন-ও বিক্রী হয়। জমির কাজ করার ফাঁকে কলোনদের ভূস্বামীর বাড়িতে বেগার খাটতে হত। সুতরাং দেখা যায় এই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় দাস-শ্রমের বদলে কলোন-শ্রম উৎপাদন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সামন্ত প্রভুরা উৎপাদনের মালিক। কিন্তু যারা উৎপাদন করছে, অর্থাৎ ভূমিদাসদের সম্পূর্ণ মালিক নয়। এই ছিল সেই সময়কার উৎপাদন সম্পর্ক।

* এই সময় ক্রমে হস্ত শিল্পে উন্নতি হয় ও নব নব আবিষ্কার শুরু হয়।
* হস্তশিল্পের উন্নতির ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়।
* পণ্য উৎপাদনে সাফল্য, হস্তশিল্পের উন্নতির ফলে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে পুঁজি সঞ্চিত হয়।
* সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গর্ভেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে ফরাসী বিপ্লব, ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং এসবের হাত ধরেই পুঁজিবাদের সূচনা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (The Capitalist Society)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল এমন একটি ব্যবস্থা উৎপাদনের উপাদান থাকে সামান্য সংখ্যক লোকের হাতে আর অসংখ্য মানুষ জীবিকার্জনের জন্য নিজেকে ভাড়া দেয়। এই সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা শ্রমিকের শ্রমলব্ধ ফল নিজে ভোগ করে। এই জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন হলেও পুঁজিপতিদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

শ্রমিকরা তাদের নির্দিষ্ট শ্রমের অতিরিক্ত শ্রম বিক্রি করে যা উদ্বৃত্ত শ্রম বলে পরিগণিত হয়। এই শ্রমি মালিকরা আত্মসাৎ করে। এই শ্রম বিনিময়ে যে মূল্য জন্ম নেয় তা উদ্বৃত্ত মূল্য নামে খ্যাত। এই মূল্যর সাহায্যে পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি বৃদ্ধি করে। এটাই হল পুঁজিবাদী শোষণের মর্মবস্তু।

এই শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রই স্বীকৃত; রাজতন্ত্র অস্বীকৃত। কিন্তু জনগণ এই পীড়ন বেশিক্ষণ সহ্য করে না। পুঁজিপতিদের শোষণ ও শাসনের ওপর শ্রমিক ও জনগণ যখন আঘাত হানেন তখন তারা নিজেরাই এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (The Socialist Society)

মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে ধনতন্ত্রের মৃত্যুর পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই বিশাল কর্মকাণ্ড সাধিত হয় সর্বহারা শ্রেণীর সংঘবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে। সমাজতন্ত্র হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মধ্যবর্তী পর্যায়। এই পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনে অরাজকতা দূর হওয়া পরিকল্পিত পথে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। এভাবেই শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটে। ■

Ref : সমাজ সভ্যতার ইতিহাস, ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা, পার্টি শিক্ষা সিরিজ (১)

অনুমিত্রা

LOVE – NO SIN

Repenting –love's a sin?
good news for you,
Love's a bliss
but knows only a few.
Those pleasing moments of love
might well if you think,
Went whizzing by
before your eyes could blink.
The passion that it brings
the delicacy of its glow
Holds your mind and heart
and gets ready for a blow.
The angling of yours eyes
your fright and your coy;
The thirsty feeling lovers have
whether a girl or a boy.
If ever was a chance
for your bodies to touch
The ecstasy of its delight
filled your heart too much.
Now, now hold your breath
and get ready for a kiss
Either grab the opportunity –
or its a grave miss.
Come on out bravely
and fly like a dove
There is no sin, my friends
NO SIN TO LOVE.

SABYASACHI DASGUPTA
English (Hons) 2nd year.

"OF GODS AND SUPER-GODS"

Gods,
Come down with the rumblings of two collosal structures
With a handful of fools and uttered :
"Let there be war."

Super Gods,
Designed as a giant noble eagle, corner to uncouth
Orgies in progress–
Began the cross burial of its hitherto committed follies;
Crucifixion of its manufactured history.

Demi Gods
Ran helter - skelter, shifted sides
Meandered propositions, propagandas, debates,
calculated their tally of profit and loss
And with gloomy faces
Drew an affiance with neutrality.

Mortals –
In the name of sacrifice,
Ulere put on the cross
Nude-nailed and bleeding with a crown of briers tant on
their heads,

As others, choked to see
"Gods of Ular."
Alas, history!

RAJEEV BHATTACHARJEE
3rd Year English Honours
Ashutosh College

THE ILLEGITIMATE CHILD

She was a packet of hatred,
She hated, in time was hated,
Unseen, unheard, unfelt,
She was hated.

Man's hunger, clumsy society,
victimized her flowering soul,
Earths' light is a mystery to her,
May, will remain so.
Crushed between mans' greed,
She waited for death,
A death, which is not quite so....

Childhood fun called her,
Flappiness of life beckoned her,
Craving for love, for affection,
She was hated,
Alas! she knew,
Aware of all that the cruel
world would give her

Hate!
So she hated,
The child yet to be love,
And yet to die,..... hated all.

SULOGNA CHAKRABORTY
Roll-86
Statistics (H).
Section - A

GEOLOGY AT A GLANCE

The diversities of mother earth
created by virtue geology's heart.

Starting from structural upto palaeo,
Everything is arranged in stratigraphic momento.

History and maths run side by side
That is the mystery of geological rhyme.

Sediment, lava and metamorphite,
Are the three bars of petrographic height.

Fossils are the only remnant cites
That make palaentology throughout alive.

Strike and dip plays their trip
Which lies within the structural's grip.

X-rays light shows crystals bright.
And is the only glow of opticals delight.

Formulas of mineral and crystal shape:
All are inclusive in mineralogy's name.

Everything thrives within its range
Physical geology is the master frame.

The economic aspect of geology
paved the path for human prosperity.

Theory, parctical and fieldwork
All are contents of geological work.

Never the less keep in mind
The subject itself is richly enshrined.

AVIK MANNA
Bsc. IInd year Geology Hons.

WILL YOU PLEASE TELL ME...
... WHY?

Just like a candle spreads light,
in a room full of darkness.
Enlightening everyone and getting brighter,
as time slowly passes by.
You did the same to my life,
bringing me out of an ocean of darkness.
And now, when I just couldn't live without you,
you blew away, will you please tell me why?

Just like the rising sun,
Sees all the flowers blossom all around.
You came into my life like a hopeful ray,
giving me a more beautiful new life.
I was so very happy to have you by my side,
Basking in the warmth of your love & affection.
Even the setting sun promises us a tomorrow,
But you went away never to come back,
Will you please tell me why?

You were just like a bottle of wine,
Tempting me to go for you.
Once started, I just could not stop,
I just wanted more of you.
Your love intoxicated me to such an extent,
That without you, I could not laugh, I could not cry.
And just like the wine disappears in a drunkard's hands,
You did the same from my life, will you please tell me why?

SOUMAVA BHATTACHARYYA
Economics (H) - 2nd year
Sec-A Roll - 1005

THE "THIRD REICH", AGAIN?

"Cruelty impresses , people want to be afraid of something. They want someone to whom they can submit with a shudder, the masses need that. They need something to dread." ***—MEIN KAMPF.***

Adolf Hitler, the greatest evil genius of this century had said these words in his prime. As we shudder at the thought that such a man ever existed, we cannot help but wonder whether there a ring of truth in his words? Corrupted heads of states, power-greedy military officials, immoral law enforcers and stoic ministers, they are not afraid of any body. They are not answerable to anyone, they do not care, they do not fear and that makes them beyond the reach or the mass.

Adolf Hitler was highly influenced by two people in life, who were apparently the main architects of his impaired thinking. Dr. Leopold Potsch, teacher of German political history and Jorge Van Liebenfels, a defrocked monk. But with all his evil political belief, Hitler's struggle was to consolidate Germany into one great nation. He believed in nothing but the oneness of the only fatherland of the world, Germany. With his Nazi regime people like Heinrich Himmler, chief of Gestapo and the S.S., Herman Goering his most trusted lieftenant Goebels, His spokesman came to light. In today's world we are often convinced by the promises of the would be representatives of the public. As the poor dreams about what is perhaps the oldest dream of mankind, that of food , shelter and cloths, these people rise to power. But what happens after those democratic elections? True the sovereignty of the country is maintained but the dreams are lost in reality. We cannot help but remember Goebels, Hitler's spokesman. He had firmly believed that if a lie is repeated convincingly again, and again, and again it doesn't remain a lie anymore. People start believing it. History stands witness that he was proved right, but he was only a henchman of a tyrant.

The R.A.F. (Royal Air Force) was no match for the Wehrmacht. Yet German bombers never bombed paris, which was entirely inhabited by innocent civilians. The German u-boats were the nightmare of the allied ships, yet they never sank merchant ships. As the Panzers rolled on defeating the Matilda tanks. Hitler had conquered one country in each hour. But we must not forget that he was an insane killer. But again, the perpetrator of such heinous crimes, Adolf Hitler, who had killed over 6 million Jews before the war was over, was an ardent dog-lover. He was always shadowed by his two beloved German Shepherds. This amazing man also loved children very much. Adolf Hitler had kept his word by marrying his mistress, Lady Eva Braun, a day before killing themselves, after a relationship of 16 years. We cannot help but wonder whether he was more ruthless than Harry Truman, who had dropped the atom bomb on a totally unsuspecting city.

Hitler said, "Four years of war give a man thirty years at a university in the way of education in the problems of life." So, are we waiting for another dictator to guide us? To change the world again? Who says that the saviour has to be a saint? He can be a monster also.

DIBYAJYOTI CHAUDHURI
1st year B.Sc. (Hons) Zoology.
Roll No 749

A SIZZLING PHENOMENON - TENDULKAR

India is a nation where many religious sects exist such as Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism & Cricket. Surprised? Do not be. Cricket has evolved as the most dominating religion in India over the past decade. And the name of the most powerful god of this religion is Sachin Ramesh Tendulkar. A name that binds a nation together. For an entire generation Sachin Tendulkar is not a person, he is an occurrence, a phenomenon whose uniqueness brushes away the rust of time. To watch him playing is almost synonymous with seeing the Northern Lights.

Almost 14 years ago, a boy with fuzzy hair, squeaky voice was involved in a 664 run partnership with his friend in a school Match. The boy scored 284 and suddenly, 6 month's later there was a murmuring in the board meeting of B.C.C.I., the topic of discussions was; should this boy be sent for Pakistan tour or not. Eventually, Sachin Tendulkar was sent with the team. Since then that boy has shouldered the weight of high hopes and ambitions rested on him by a hesitant nations. It is the weight of performing consistently that has not defeated him but more often he leaves more of a memory than an impact.

Tendulkar's impact on Indian the psyche however, goes far beyond his cricketing ability. The 30 Test hundreds and 33 one day centuries, the thousands of run he has scored so far speak for themselves. Watching Tendulkar goes far beyond the cricketing experience for the mob, and occasion beyond the matter of witnessing the fine sets of strokes that he possess. It is almost a religious occassion an aesthetic experience. His impact on this nation can be best described by an incident in 1999, during a Test Match at Eden Gardens. Shoaib Akhter rearranges Rahul Dravid's stumps. Some display of public grief is mandatory. Instead it is met almost with thanks, reason being Tendulkar is the next man in. In the very first ball Tendulkar is bowled too and disbelief marries despair. The earth has stopped turning for a while, for millions of people. Such is his impact, Irrational passions symbolise Indian Cricket. India has never seen any thing like this and it will not either. Tendulkar's repertoire is not open to questions. His persuit of excellence is undeviable, skillful, confident, competetive, self motivated and even self indulgent. His figures show that he is an extraordinary talent moulded with preserverence. he is a hero at a time when there have been few is less than an exaggeration.

The two c's, cinema and cricket is that links this vast nations. from a 5 year child to an adult of 50 years every one knows Sharukh and Sachin. The actor destroys the villans in movies which is what the batsman does to the bowlers occasionally. The actor owns the big screen, batsman the small. Every innings we saw in pristinc colour was pictured in the memory. We all are followers of the Cricketing God Tendulkar. From his first century in 1990 at manchester against England where he scored and unbeaten 119 which came of 189 balls with 17 fours and after batteling for 225 minutes, to his century No. 30 which also came against England in 434 mins, consisting of 19 4's 3,6's and facing 330 deliveries, he has come of age. Sachin Tendulkar is about to wear the Indian Test cap for the 100th time. On this achievement of his the whole nation stands to salute the "Little Master". He has brought pride and recognition to the Indian game of Cricket.

Indian Cricket has leaned on his shoulders for over a past decade. A batting God disguised as the boy next door. And this empowers his legend. He walks down the field shorn of Gum chewing swagger, just a little fellow of few words, and then started savaging the bowlers. Sending the ball galloping into the boundary boards. It was not only his stills that captivated

it was an assurance. "My God, this Indian did not feel awe of the bowlers", exclaimed his opponent.

The romance was built on one last substantial piece. The very heart of all worship. He is about to play his 100th Test match. When he finishes his career he will hold most batting records that matter. Today, only one thought lingers every Indians mind, will there ever be another Tendulkar ? Probably not.

Thus, as Indian Cricketer Sachin Ramesh Tendulkar stands unique and alone.

RANA PRATAP SINGH
1st year B. (Sc)., Roll No 401

RECIPE FOR 'SUCCESS'

Serves : Anyone willing to taste.
Time required : A few minutes (may also be a few years)
Ingredients :
1 cup perseverance
1 cup patience
2 table spoon confidence, finely chopped.
a few strands desire
1 bowl of strong determination
some close-up smile for garnishing.
experience and knowledge to taste.
To prepare :
Heat perseverance and patience in a pan. Add the strands of desire soaked in a bowl of strong determination. Season with experience and knowledge. Simmer till a thick paste is formed. Remove the pan from heat.
To serve :
Pour the delicious treatment into an attractive plate. Sprinkle the finely chopped confidence over it and garnish with some close up smile. Serve HOT on COLD.

A DIFFERENT VISION

"Big thoughts in young minds"—once said an anonymous philosopher, not stating thereafter the consequences of such phenomenon. However, even if I was in the dark about such ocurrences, I did show courrage to work it out again on this mere paper with a petty pen of mine, the courage to change the society, the courage to draw attention to the eradication of an evil that has only very recently started tormenting us, burning us in the very fire of his self-created hell.

Who is he? Where is he from? Is he the devil incarnation on earth or is he the devil within us who thrives well and seeks refuge in our misdoings or rather to be more precise, in human carelessness. Highly confused, aren't you? You've read so far and really can't figure out who the culprit is, isn't it? So, let me help rediscover the horn-headed, tailed, red coloured, slimy devil, who, you know, exists. Confused yet again? I am certain you have engrossed yourself in your thoughts trying to recall seeing such a being anywhere around you, on your way to your workplace or while you are in the theatre watching a movie. I suggest you better stop thinking and listen to what I say, with eager consciousness and concentration for I am here only to clear the doubt and suspicion hovering over your mind. I can tell you that you have met the devil, not at one place or time but perhaps many. You have met him in your workplace or may be he sat beside you in a theatre or its even possible that you have ate with him, drank with him, frolicked with him and shook hands with him. But you have not known him only because of his excellent disguise. The devil hides behind human hide. I understand that you could still be a little puzzled. So, I guess, its high time I actually blurted out the name. AIDS—yes, he is the one devil who resides in the new millennium and his home is in us, the unfortunate human race.

Heaving out a sigh of relief, as you could be doing now, I somehow feel I have actually poured water on your blooming imagination, not really to nourish it but to demolish it because I somehow comprehend that all this while, in spite of my somewhat dramatic clues and hints which I admit have failed to hit the bull's eyes, you were hardly expecting this virtual monster of our real society. Coming as far as this, you might suddenly want to put a stop to reading this further on, for you feel that useful and important as it might be, you have had enough of AIDS, considering the fact that you already know a lot about the disease which also includes protecting yourself from its grip. But mark my words, this piece of writing is different because it comes from a person who is neither a part of the municipality, annually publishing reports of the disease without caring, nor is she a working member of a research group touching up every bit of information that it can gather about the origin, evolution and medication of the disease. But the writer, evidently me, is a person who is actually held in awe of the devil's unthinkable power of destruction. She can hardly understand and is not at all interested about the sæience concerned with the disease or about any statistical report conveying formal news of the disease. Instead, I will actually discuss things on the basis of emotions and feelings of a young girl who understands, or rather thinks that she does, the fear, the uncertainty and the certain ending—death. I actually belong to the age group which is known as the "adolescence" and the group which, is prone towards carelessness and hence be the probable victims of AIDS.

Is that so? Is that the truth? I agree, that is somewhat likely but it only contains a wee bit of the entire truth in it. "Adolescence" has many definitions to its name. It would certainly do no harm if I mention what it is. In general it is defined as the period in one s life when one is neither a child and nor an adult. Uncertainty and restlessness of mind are the key terms which make this group significant and the period worth living. However, immature as we are, we tend to make mistakes, some very trivial but others so fatal that it ultimately leads to our

death. I understand that we are to be blamed for running after unnecessary excitement and spice that we are eager to add in our otherwise not-so-happening life without being careful or without taking measures for our protection. I am very sure you would, right now, definitely feel the same, if you are an adolescent, though you would not say it aloud, and will agree with much contempt if you are an adult, having crossed the boundaries of adolescence sometime ago. If you are an adult already reading this write up you would, not finding me nearby to impart, say to yourself that it is only due to the adolescents' way of rash behaviour. Certainly, I agree. I guess, "love" has attained the badge of an excuse. This is a rather vague remark but I believe this is what things have come to presently. What adolescents now tend to do is mix up love and sex. Love to them solely revolves around the aspect of sex. Definitely, sex forms an important part of love which only comes much later when certain norms are reached in a relationship but certainly not before that. It is needless to say that most adolescents, in present times, have been engaged in sexual acts which have been careless in most cases. Thus, spread of the disease has been possible and made us more vulnerable.

Apart from the contribution of adolescents in the breeding of AIDS, the adults of our society do play a certain role in it too. It is the role of the caretakers of the society. Being highly modern as we are, a fact that very often we boast of and one which is the root of our pride, we cannot deny that our society still dwells in the careless past. The different metropolises of our country could boast of thousands of brothels, though people who visit them would never admit such a thing in public, as it has become important to hide the dark truth of our society. Hardly anyone from this particular section of people are adolescents. This shows how irresponsible the "caretakers of the society" are. Most of them are working men who, having "nothing better to do" after a strenuous day at work and are attracted to these places. Sexual pleasure is what is achieved, but only after paying a very dear price—their own lives. However, this is prevalent, in both the elite class and the very poor people. Thanks to their education and money, protection is always at hand for the elite class (whether they use it is a different case altogether), and suffering comes to the poor. Sense is achieved only after the damage has been done and only after that do we realize the reality behind the whole thing. Life reappears with all its beauty, ecstasy and vigour in front of them who are infected with the disease and the urge to live is latent within them. Only then do mistakes become clear and those people become so frustrated with life that their last months become miserable. Life becomes significant and meaningful only when death appears to take it away.

However, leaving the already infected aside, with a sad heart, we can actually look forward to putting a stop to the spread of the disease that is happening so rapidly, of late. A newspaper report, saying that the beginning of this millennium had actually marked the presence of half a million AIDS patients in our country alone, is really very shocking. The only solution to this universal problem is by creating social awareness. Though it is not very easy, yet I would say that it is not impossible. It will definitely take time but we must not lose patience.

Education will also form an important aspect of the social awareness. Once people start realizing the danger the disease brings with it before actually being infected with it, nothing is lost. Life will still be beautiful and perhaps, who knows, reappear once again shining brightly in the seven colours of the rainbow.

Remedial measures

1) Posters 2) Works Reports & Seminar 3) Street campaign

SREEMOYEE MUKHERJEE
1st yr. B. Sc., Economics Honours

WOMAN LABOUR FORCE IN THE LIGHT OF MODERNISATION

What is the actual place for women today in the world of modernisation? The question is quite complex. To find the proper answer we are to make an indepth study taking various factors into consideration. Let us first take an example of Bangladeshi woman. Many of them in that country are still secluded from the clear vision of the world by a 'Parda system', when the irony of fact is that a considerable proportion of woman, in the same country, are seen increasingly taking part in agricultural field works. Further, poverty forces them to take on other arduous jobs such as road construction, building construction, etc. for their in livelihood. These activities of women are in addition to their contribution of labour in other essential jobs in agriculture such as seed selection, processing, winnowing, threshing which are generally done within the four walls, in most of the cases remain unrecognised. So in general there remain two opposite faces of social condition of these Bangladeshi women, which can be treated as a general feature of less developed countries.

Although a less developed country is primarily characterised by the predominance of rural areas and agricultural works there is also a large number of women who provide their labour in the industrial sector of the economy. Being steeped in poverty, they often find the solution by channelising their labour through home based production inorder to augment their total family income. As a result some traditional "female industries" have grown up. Now the basic question is that how the men trend of modernisation is going to affect this women labour force—whether they accept it as a boon or a curse, because on one hand the avent of new techniques destroyed some sources of traditional earning of the women. On the other hand it has opened up thousand of new avenues of livelihood. But the women labourers are kept so much confined within the four walls of textile, clothing, tobacco industry and marginal service in urban informal sectors that they have lost their internal mobility to serve in these new sectors. Besides, due to lack of advancement in women education most of them who are already with a job in organised sector find it difficult to cope with the new dimension of the nature of work in the course of modernisation. So, although modernisation has brought various job opportunities for women in the areas of trade and commerce, management, finance etc., how far they are accessible is the question. On the other hand the young girls who are in search of a job cannot find the proper places where they may be suited, due to lack of information and improper infrastructure. For instance, the plants that are established in institutional estates and export processing zones often requires rural skilled women with the virtue of concentration, patience, keener eyesight. Though there are such women in rural areas they are not ready to come to those institutional estates and hence the requirements of none of the sides are being fulfilled.

The scenario is somewhat different in the case of young women and children. Often it is seen that the employers of some formal sectors, where there prevails the social perception that women are more skilled, prefer young girls and children. So a large number of them are seen to provide labour in clothing, simple electronic activities not only due to their dexterity, discipline and speed but also due to the fact that these young girls can easily be subjected to a lower wage and exploitation. In some cases they are even dismissed after reaching the legal age at which they become entitled to adult wages.

The problems discussed can be attributed not only to improper infrastructure but also to social injustice. There are certain social evils which constitute the cause behind the exploitation

of women labour force. One thing is established empirically that poorer the country, the more is the woman labour hour. In many parts of East Africa they work sixteen hours a day. In Burkina Faso, women get only a little more than one hour per day, exclusively for themselves. Though they provide a large proportion of labour force they are still unorganised. They do not have any powerful trade union to argue in favour of their demands. So they are often employed only because they can be paid much less than the male workers for doing the same job. In Srilanka the female labourers receive only 66%-75% of the male wage while in Honduras they are paid only about 70% of it. Besides, some jobs, especially in agriculture and in various unorganised industrial sectors, are still provided with primitive equipments and hence remain low in productivity, although ILO research has indicated that women's produtivity can be increased by using improved technologies.

The discrimination about the male and female wage rates, as described, should be erased as soon as possible and the importance of the earning of women labourers should be readily understood. It has got a three dimensional importance. Firstly, it is a complementary earning in case of poverty-striken families. In Syria women from landless peasant households provide 35% of family labour days devoted to agricultural production while women from middle and rich peasantry provide only 21%. The next feature is very important. The wage of women labourers has an important role to promote child nutrition. Joanne Leslie's 1987 critical review of fifty empirical studies on the relationship between women's earning and child nutrition showed a positive correlation. Hence efforts should be launched to raise mother's income. But the most interesting part of the story is that the children belonging to a woman headed family are also nutritionally better off than a male-headed family. This is due to better allocation of income towards supplying high calorie food. Finally it is also observed that whenever the economy shows a trend towards depression the women labour force become unbelievably active as it happened in chile during 1974-'75 when it increased sharply from 18% to 22.4%.

The analysis is done inorder to represent the basic importanoes of women labour force in the world of modernisation and also in order to reveal the obstacles and exploitations they have to face. Hence anti-poverty strategies must be designed to address the social, economic constraints and the problems of relatively lower wage of women labour force. An effective strategy for reaching this goal should include a focus on women labourers themselves rather than on women as members of households only. The policy significance is also quite evident. Policy makers must consider development and intervention for women separately at each stage of policy and project development for all social and economic sectors.

Shyamsree Dasgupta
Department of Economics
Section-A, II year
Roll No. : 289

WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT

In the 1940's and 1950's there was a company called National Wrestling Alliance which travelled from town to Town in the USA and performed for the people. It was much like a travelling fair or circus with the performers being men and women who had retired from their earlier professions. In the late 50's and early 60's a man called McMahon broke away from the Alliance and formed a rival company called the World Wrestling Federation. There was no looking back. With the help of some really talented individuals in the 60's and 70's like Pedro Morales, Bruno Samartino, Jimmy 'Superfly' Sunka, the 7 foot tall Andre the Giant, Peter Maiviya and Gorilla Monsoon, WWF started becoming a well-known profit making body.

In the 1980's Mr. MacMohan died and the mantle passed on to his son Vincent Kennedy McMahon. He gathered around him a team of good financers, officers and young men hungry for sucess and stardom. In the ring under the leadership of 'Hollywood' Hulk Hogan and the 'Nature Boy' Rick Flair a new crop of young stars emerged like never before. Bret 'the Hitman' Hart, undertaker, 'the hearbreak kid' Shawn Michaels, Ultimate Warrior, sting, Lex Luger, the 250 kg. individual yokozun became famous in leaps and bounds and became—household names. The WWF became a multi-million dollar industry.

In the 1990's under tbillionire Ted Turner and Eric Bieshoff and rival company called World Championship Wrestling was establish. With its stars like Hogan, Flair, Macho Man, Randy Savage, Steeiner Brothers, Kevin Nash and others, it posed a serious threat to WWF. But the WWF with its own young brigade of HHH, The Rock, undertaker, Kane, X Pac, British Bulldog, Chyna, the notorious 'Degeneration X' and others, finally emerged victorious with the eventual result being that WCW coming under WWF's fold.

WWF has now changed it, name to World Wrestling Entertainment due to a legal tussle with World Wildlife Fund. Nevertheless under the leadership of Vince McMahon & Linda McMahon, WWF with its stars like Paul 'Hunter Hearst helmsley', Levesque, Dwayne, 'The Rock Johnson', 'Olympic gold medalist' Kurt Angle, 'The next Big Thing' Brock Lesnar, 'the Giant' Big Show Paul White. Edge and the oldies like Hogan, Flair an undertaker has become a multi-billion dollar industry and is one of most famous and most popular corporate bodies in the world. It has spread to all the corners of the world from Japan to USA, from Sweden to South Africa, New Zealand and Argentina.

Bishwaksen Bandyopadhyay
English (Hons) IInd year

A FEW STOLEN MOMENTS

"Tell me not in mournful numbers, life in but an empty dream." The words of the poet live on despite the unjust shackles of fate. They live on in harmony with hope in most hearts in mine too; and the source of their sustainance are a few stolen moments, stolen from life, despite fate.

There was little I could expect from life, yet so much that I hoped for; perhaps more than any other handicapped child would. Unlike others I was born with weak legs, so they could not support me and lift me at the mercy of grandma's wheelchair; father often hoped before my birth, that grandma would be reborn as his daughter, but that I would take her place so literally he scarcely knew! We were a family-mom, dad, Chris and me and I was a constant source of joy for my parents till last Chirstmas, when they cried, for I asked them if Santa would give legs to me.

Life trudged on this same way, all the while as I wondered, I was able to reflect wisely enough and yet, I wondered. It was a bright morning in March, one of those special days when I would be taken to the meadows for my monthly recreation after dad and Chris were back from the barn. The flowers looked lovely and fresh by a fresh shower last night and they lent the breeze a refreshing mesmerising fragrance. I wondered then, if ever they felt the need to walk, run and dance, like I did. Dad picked me up carefully and put me down on the wet grass as a I sighed at the awesome breath taking creativity of the Almighty. My parents sat by my side till I coaxed them to take a stroll in the neighbouring apple orchards which mom loved. Chris was away, riding.

I lay alone marvelling at the luck of the soaring birds, piercing their way through the clouds as they swayed to the music of some unknown enchanter. At that moment Chris returned and read the agony and desire in my eyes, overwhelmed by which he mounted me painstakingly on his pony and set off galloping through the meadows; caring little for the consequences.

I had long cherished the secret desire to walk once through the orchards and the meadows and here I was flying through them. I had never before known what it was like to defy the direction of the wind. We galloped and my heart Soared with the birds swaying to the Music of that same unknown enchanter. Mountains and brook, barns and cattle, I left them all behind as I journeyed with the elbe, swifter and blither than it, to eternity and beyond. My soaring heart suffered with a mirth stronger than my disability and shower of dreams enlivened the parched desert within it. That moment stolen from the forbidden stores geared by an uncessant life in my dying hopes, yet again I dreamt of flying, moving, defying my immobility and the dream enraptured on that morning came true again on a winter afternoon when I slipped per chance from the sleigh and slid over the snow till came to a gentler slope. This was a day after my fourteenth birthday and I treasure those moments as my best birthday gift ever.

We were farmers by the cuontryside where fine arts, like music, were a rarity. I had only heard drums in the name of music, rarely on Saturday evening get togethers. One evening, a Buddhist preacher and his wife spent a night in our village and the latter played on the old dusty piano in the bar and created magic for the ears. She even held my hands and made me tap keys for melody. That was enthorlling again, I soared and danced or at least felt the joy dancing could impart to any individual. On the wings of music I flew higher than the birds and danced on the clouds.

Their were moments when I danced, soared and whizzed past my disability I stole from the treasure of joy that was forbidden for me. I treasure them as memories that now and then rejuvenate the dreams stored away in some forgotten nook of the heart and thank nature for being so generous as I send up a prayer asking for what I know not, as tear drops trickled down, I know not why.

Saoli Das
1st year (socio Hon)
Roll : 301

A BROKEN RELATIONSHIP

It was raining heavily since morning. The sky was completely overcast and the only sound that could be heard from time to time was that of the raindrops pouring with a pit-pat. It was a Sunday and Santanu as usual was reading a newspaper in his balcony when the phone started ringing. He lifted the receiver only to find a female voice at the other end. 'Good morning, Santanu' said the voice in an intimate tone. He felt little bit embarrassed as he could not recognize the lady though her voice seemed to be very familiar to him. But suddenly he knew that it was no one but Radhika. Santanu and Radhika were both intimate friends in their college days and after that Radhika got married and since then they had no connection. 'O, Radhika you always make me puzzled', he said and added jokingly, 'you forget that I don't have a sixth sense to know someone who is calling me after four years'. 'Yes, four years' she said lowering her voice, 'So, how is life?' she piped in and 'by the way are you married now or still...?' 'Well, I am still leading a life of a modern Endymion', he said very casually. The emotions so long being suppressed in some remotest corner of the heart now suddenly jolted his memory. He restrained his emotions and asked Radhika, 'What about you? I hope you are very happy with your husband.' 'Yes, very happy' she said but with different tone. 'Santanu, you know I often feel that what we call marriage is actually a hollow sham in the disguise of a human institution.' 'In this four years of marriage I have learnt that love, sympathy, understanding are mere words of antiquity and they have no place in this materialistic world,' she said almost gasping for breath. Santanu realized that something very serious had happened with Radhika and began to surmise what it could be. The shock came instantly. 'I have decided to divorce my husband', she said quitely. 'I want a human-being, Santanu, someone to confide in.' Santanu did not understand what she meant. 'I do not want to live with someone who has nothing to do with me but only with my money,' she cried almost in despair. 'I need your help' she said and waited for an answer. When Radhika was saying all these things to him, Santanu's thoughts wandered back to some distant post where lay buried those faded, worn out memories.

The street wore a deserted look now because of heavy downpour the previous night and in between the shrill sound of passing vehicles disturbed the prevailing silence. Everything seemed to be dull and dismal outside and as expected, few minutes later, the storm broke. Though its intensity died out after sometime, the intensity of the inner storm increased more and more. Radhika's phone-call resurrected his memories and his mind harked back to his college days. 'May I come in Sir?' a girl of medium height, dark-eyed and dark haired entered the class and sat beside him. Well, the girl was Radhika. It is often said that the opposites attract. Probably it also happened with Santanu and Radhika. One introvert and the other highly extrovert. One always took life seriously while the other was always cheerful and knew how to enjoy life.

There was hardly anything common between them but still there was little, which Santanu did not know about Radhika and Radhika about Santanu. But as it seems that providence had some other plans in his mind. One day Radhika came to college, looking very sad and dejected. 'What happened, Radhika?' asked Santanu. 'My marriage has been fixed for the next year,' she broke down and started crying. The hearbeat stopped for a moment as Santanu heard this dreadful news. The dreams, so long carefully woven, were suddenly crushed and the fragments lay here and there. An inexpressible pain wrung his heart and he could say nothing. He left the place immediately. The whole day he confined himself in a room. Late at night Radhika called him up. 'I want to tell you somthing, Santanu,' she said

and continued, 'I love you still and you must promise me that whenever I need your help, you will be there beside me.' Santanu hardly had any words and said quietly, 'I will be always with you.' That was the last conversation they had over the phone.

'Are you listening to me?' Radhika's voice suddenly broke his trance and the mind so long wandering aimlessly in the past, now returned to the present. 'Do you remember what I told you before we parted?' 'Yes I do remember,' he said. 'I want some place now in...' her voice choked up and she could not complete the sentence. Tears rolled down Santanu's cheeks and some fragmented lines of Jalalu'd-din Rumi occurred to him :

'When we fall in love we are ashamed of our words.
Explanation by the tongue makes most things Clear,
But love unexplained is better.'

DHRITISHANKAR SEN
3rd Yr. B.A. (Eng. Hons.)

LAUGH IT OUT...

A true story from the Japanese Embassy in US :
Prime Minister Mori was given some basic English conversation training before his visit to Washington to meet President Bill Clinton. The Instructor told Mori : "Prime Minister, when you shake hand with President Clinton, please say, 'how are you?'
Then Mr. Clinton should say, "I am fine, are you?" Now you should say, "I too." We, the translators, will do the rest for you."
It looks quite simple, but... when Mori met Clinton, he mistakenly said, "Who are you?"
Mr. Clinton was a bit shocked, but still managed to react with humour : "Well I am Hillary's husband, ha ha..."
Then Mori replied confidently,
"I too, ha, ha, ha...".

DEBDEEP SAHA
B. Sc. (PCM), 1st year

DO YOU NEED A REASON TO LAUGH?

Son : "Dad, I want to get married."
Dad : "Son, you're not wise enough for that."
Son : "When will I be wise enough then?"
Dad : "When you drop the idea of getting married!"

KALPITA ROY
B. A. (English Hons.)
1st year

THE POLITICAL STRUCTURE OF SOCIALIST SOCIETY

The political structure of socialism, as has been observed by many years of experience, acquired by the Soviet Union and the Fraternal socialist countries, constitutes a mighty force. It is a well-articulated system of supreme and local organs of political power, of government and management of society and the state which incorporates the ideological and political vanguard of society, the Communist Party, together with the trade unions, the co-operatives and other mass associations of the working people and work collectives. Just as the economic system of a society ultimately determines where power resides, so also the political system, the organs of power and social management are able to exert enormous influence on the course and nature of social and economic development and on social consciousness. On them depends to a large extent the rate, volume and quality of production, the housing programme, the steady increase in living standards, the development of education, medical services, etc. For this reason, the ruling Marxist Leninist Parties have called for the all-round development of the political system of the socialist countries and of socialist democracy. Improvement of socialist democracy means, first and foremost,ensuring an even broader participation of the working people in the management of all public affairs, the further development of the democratic foundations of the state and the creation of the conditions necessary for the all-round development of the individual

The socio-political and ideological unity of the peoples of the socialist countries and the common interest of all the working people in steady progress along the road to socialism and communism together constitute a powerful source of strength for the socialist political system. While capitalist states are shaken by political crisis, the struggle for power and frequent charges of government, the socialist system is distinguished by political stability and social dynamism.

KRISHNANJAN GHOSE DASTIDAR
B. Sc. (General) 3rd Year
Asutosh College

TELL ME WHOM YOU LOVE AND I WILL TELL YOU WHO YOU ARE

I stood up from the bench, straightend my tie and studied the crowd of people making their way through the metro station. I looked for the girl whose heart I knew but whose face I didn't, the girl with the rose.

My interest in her had begun a few months ago in a library. Taking a book off the shelf, I found myself intrigued, not with the words of the book, but the notes pencilled in the margin. The self handwriting reflected a thoughtful soul and perceptive mind. I discovered the previous owner's name... Miss Divya (Changed). With time and effort, I located her address.

I wrote her a letter introducing myself and inviting her to correspond. During the next few months, we knew each other through mail. Each leltter was a seed falling on a fertile soil. A romance was budding. I requested a photograph but she refused. She felt that if I really cared, it wouldn't matter what she looked like.

On her birthday, we scheduled our first meeting—7 pm at the metro station she wrote. "You'll recognise me by the red rose, I will be wearing on my lopel. So at 7 pm, I was in the station looking for a girl whose heart I loved, but whose face I'd never seen".

A young woman was runing towards me, her figure tall and slim. Her burgundy hair lay back in curls from her delicate ears, her eyes were blue as flowers, her lips and chin had a gentle firmness and in her pale green suit she was like springtime come alive. I started towards her and entirely forgetting that she was not wearing a rose. As I moved, a small provocative smile curved her lips. "Going my way, man" she murmured.

Almost uncontrollably, I took one step closer to her and then I saw the woman wearing a rose. She was standing almost directly behind the girl. A woman well past 40. She had greying hair, she was more than plump, her thick ankled feet thrust into low heeled shoes.

The girl in the green suit was walking quickly away. I felt as though as I was split in two... so keen was my desire to follow her and yet so deep was my longing for the woman whose spirit had truely companioned me and upheld my own.

And there she stood. Her pale pump face was gentle and sensible, her grey eyes had a warm and kind twinkle. I didn't hesitate. My fingers gripped the small worn blue leather copy of the book that was to identity me to her. This would not be love. But it would be something previous, something perhaps even better than love, a friendship for which I had been and ever be grateful. I squared my shoulders and saluted and held out the look to the woman even though while I spoke, I felt choked by the bitterness of my disappointment. "I am Priyanko and you must be Divya (Charged). I am so glad you could meet me; may I take you to dinner?"

The woman's face broadened into smile, a tolerant smile. She answered. "I don't know what this is about son, but the young lady in the green suit who just went by,she begged me to hold this rose and she said if you were to ask me out to dinner, I should tell you that she is waiting for you in the restaurant across the street. She said it was some kind of test."

It's not difficut to understand and admire my biggest friend and best enemy's wisdom. The true nature of a heart is seen in its response to the un attractive. "Tell me whom you love and I will tell you who you are," Houssaye says.

Priyanko Chaudhury
1st yr (English Honours), Roll No. : 144

संघर्ष

संघर्ष करो, संघर्ष करो कभी न मानो हार
टूटे सास न छूटे आस जमकर करो प्रहार
बाधाएं चट्टान बनी हो
उनसे भी सिर टकराओ
चाहे दर्द घना हो
फिर भी कभी ना घबराओ
चट्टानें सब होगी चूर
बाधाएं सब होगी दूर
लेकिन फौलादी निश्चय से करते रहो प्रहार
संघर्ष करो संघर्ष करो कभी ना मानो हार।

चाहे असंभव सब बतलाए
तुम यह कभी न मानोगे
दृढ़ निश्चय पर्वत को झुकाए
संदेश सही यह जानोगे
कितनी भी हो विपत्ति बड़ी
चाहे कितनी हो मुश्किल की दीवार खड़ी
हिम्मत से बांध तोड़ो
मुश्किल से दीवार
संघर्ष करो, संघर्ष करो कभी न मानो हार।

Mrithunjoy Gupta
B. Sc. 2nd yrs (I.F.F.)

کشمیر میری نظروں میں

وسیم اختر۔ بی اے فرسٹ ایئر۔ رول (۲۰۰،۳۰۷)

قدرت نے دنیا کو بہت ہی حسین اور خوبصورت بنایا ہے۔ ہندستان بھی ایک عظیم اور بہت خوبصورت ملک ہے۔ کشمیر اس کی خوبصورت میں چار چاند لگتا ہے۔ اس لئے کشمیر کو ہندستان کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی حسین، خوبصورت، دلکش، پُرکشش جگہ ہے کہ دور دور سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لئے آتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا بہت ہی خوشگوار، پُرلطف اور صحت بخش ہے۔ یہ ایک وادی کا علاقہ ہے۔ چاروں طرف سبز مخمل کی چادریں ہیں۔ پورا علاقہ سفید برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور سر پر کھلا کھلا آسمان، نیچے سبز وادی، اس دل فریب منظر کو دیکھ کر بھلا کون متاثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہتر سے لوگ کشمیر آتے ہیں۔ اور یہاں سے حسین یادیں لے کر جاتے ہیں۔ کیوں کہ یادوں کا نام ہی تو زندگی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں شاہ جہاں نے اپنے حسین خیالات میں کشمیر میں نشاط باغ شالی مار باغ کی دلکش تعمیرات سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ اگر گرمی کے موسم میں لوگ یہاں آتے ہیں اور کشمیر کی سرسبز وادی میں، خوش نما پھولوں میں اور دل فریب نظاروں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیسے وقت کٹ گیا ہے۔ کشمیر کو ایک صحت بخش مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو کشمیر جانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ کشمیر کی خوبصورتی کو سوئزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ شام کے وقت نشاط باغ سے ڈل جھیل کے کنارے سے سورج غروب ہونے کا منظر بڑا ہی دلفریب ہوتا ہے۔ یہاں کا موسم بڑا ہی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جب یہاں برف باری ہوتی ہے۔ تو پہاڑوں پر جمی برف بڑی ہی دلکش معلوم ہوتی ہے۔ پورا علاقہ برف کی لمبی چادر تان لیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے سفید نرم گالے زمین پر اتر آئے ہیں اور ہم زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر پہنچ گئے ہیں پہاڑوں کی بلندیوں سے جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ نظارے کسی اور جگہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ جو خوشہ اور مسرت وہاں میسر ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہوتی۔ ڈل جھیل سیر کرتے وقت اتنا پُرلطف نظر آتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لئے اپنے سارے دکھ اور درد بھول جاتے ہیں۔ صحت بخش اور پُرکشش مقامات، حسین نظارے، سدا بہار درخت، خوشنما پھول، خوبصورت پہاڑیاں، سرسبز وادیاں، ان سب کی وجہ سے کشمیر کو قدرتی مناظر کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی انہیں تمام خوبیوں کی وجہ سے غیر ملکی سیاح بھی اس مقام کا لطف اٹھانے کے لئے ہر سال آتے ہیں۔ جس طرح یہ مقام اپنے آپ میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ گھریلو دست کاریوں میں سب سے نمایاں کردار عورتوں کا ہے۔ یہ بہت ہی ہنرمند اور محنتی ہوتی ہیں۔ برتنوں پر مینا کاری، اونی سوئٹر، قالین، دوشالے، شال۔ بہت مشہور ہے۔ یہاں کی شال تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔

کشمیر چوں کہ ہندستان کی سرحد پر واقع ہے اور ساری خوبیوں سے آراستہ ہے، پیراستہ ہے اسی لئے پاکستان اسے اپنے ملک میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہندستان کے عوام یہ نہیں چاہیں گے کہ اتنی خوبصورت جنت کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دیں کشمیر کو لے کر ہندستان اور پاکستان کے بیچ نہ جانے کتنے ہی بار جنگ ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کشمیر ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ ☆

گجرات کی کہانی

ریحان حمزہ خان
(کلاس ، بی ایس سی تھرڈ ایئر)

گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی ایک ایسا بد بخت، چالاک اور بے حیا انسان ہے کہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی کی پھٹکار اور لتاڑ پڑنے کے بعد بھی راہ راست پر آنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور مستقل طور سے ہٹیان بک کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب مودی نے گورو یاترا نکالنے کا اعلان کیا تھا تو وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی ایما پر نائب وزیر اعظم اڈوانی نے مودی کو وارننگ دے کر یاترا کو رکوادی تھی لیکن مودی کب ماننے والا تھا۔ س نے واجپئی اور اڈوانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رتھ یاترا شروع کر دی جو صحیح معنوں میں گورو (فخر) یاترا نہیں ہے بلکہ نفرت یاترا ہے۔ اس کے بطن سے مستقل نفرت پھوٹ رہی ہے جس کے نتیجے میں ریاست کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دوری بگڑتی جا رہی ہے۔ مودی کا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ اس کی باتوں اور عمل سے دونوں فرقوں کے درمیان روایتی اتحاد اور بھائی چارہ بالکل ختم ہو جائے اور گجرات پورے طور پر سے ہندوتو کی آغوش میں چلا جائے تا کہ وہاں مستقل طور سے بی جے پی کا راج پاٹ قائم ہو جائے اور نفرت کی بھٹی دہکتی رہے۔

مودی کی گورو یاترا کے تیسرے دور کا آغاز ہو گیا ہے لیکن اس دوران اس نے جو کچھ کہا ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے دل آزار اور نا قابل برداشت ہے بلکہ از حد ملک و قوم دشمن بھی ہے جس کا بیک وقت قومی اقلیتی کمیشن، قومی حقوق انسانی کمیشن اور خود بی جے پی کے تمام چھوٹے بڑے لیڈروں نے نوٹس لیا ہے یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد نریندر مودی جلد سے جلد الیکشن چاہتے تھے لیکن سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔

وزیر اعلیٰ نریندر مودی، سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کے جنرل سکریٹری ارون جیٹلی، بی جے پی کے صدر وینکیا نائیڈو، یہاں تک ملک کے نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ گجرات اسمبلی کے انتخابات اکتوبر میں ہو جائیں تا کہ بی جے پی کی جیت کو یقینی بنایا جائے لیکن یہاں بات الٹی ہو گئی اور صرف الیکشن کمیشن ہی کی چلی جس نے گجرات حالات کا مفصل جائزہ لینے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ فی الوقت گجرات کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں اسمبلی انتخابات کرائے جا سکیں۔ یہ حکومت گجرات کے تئیں کمیشن کی جانب سے عدم اعتماد کا بدترین اظہار ہے۔ خدا بھلا کرے ملک کے قومی ذرائع ابلاغ اور ایسے سیکولر اور ہر قسم کی عصبیت سے پاک سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور تنظیمیں جنہوں نے ضمیر کی آواز پر صدائے احتجاج بلند کی اور کھری سچائی کے بیان کے اظہار میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

پھر باری آئی گجرات کے مشہور اکشر دھام مندر کی جس میں دو دہشت گرد گھس کر بے گناہوں کی خون سے ہولی کھیلنے لگے۔ اور قریب ۲۴ گھنٹے تک ہندستان کے بہترین بہترین پولس فورس کے ساتھ لڑتے رہے اور دوسرے دن صبح کے قریب مارے گئے پورے گجرات کی کہانی تین دور سے گزرتی ہے پہلا دور وہ تھا جو گودھرا میں ہوا تھا وہاں بے بس اور معصوم لوگوں کی جانیں لی گئیں۔

پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے مسلمانوں کی خون کی ہولی کے ساتھ جب گجرات میں فساد برپا کر کے پورے مسلمانوں کو کاٹنا (قتل عام) شروع کیا گیا۔ اس وقت کوئی بھی پارٹی نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائی جبکہ پوری دنیا یہ اچھی طرح جان رہی تھی کہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پورا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم گجرات تشریف لے گئے۔

یہ خوب اچھی طرح سے ہندستان کے عوام اور ساری دنیا جان رہی تھی کہ گجرات میں ہوئے واقعہ ایک منصوبہ بند سازش تھا لیکن اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا اور اس آسانی کے ساتھ بھول گئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔

پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے ہندستان کے مشہور اور گجرات کے سب سے بڑے اور مشہور مندر اکشر دھام مندر کی جس میں دو دہشت گرد آسانی کے ساتھ گھس کر معصوم لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کئے یہ نہایت ہی شرمناک اور گری ہوئی بات ہے۔ کیوں کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کی معصوم اور بے گناہ قصور لوگوں کی جانیں لو۔

اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسانی جانیں لینے کا حق انسان کو نہیں ہے اس لئے میرے اسلام بھائیوں سے التجا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اسلام کی روشنی میں کرے۔

جو گجرات کے مندر میں ہوا وہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے اور شاید اس سے اب گری ہوئی حرکت اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اکشر دھام مندر کے ٹھیک سامنے وہاں کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کا گھر ہے وہاں ہر وقت پولس رہتی ہے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ دونوں دہشت گرد اے کے ۴۷ اور گرینیڈ لے کر آسانی کے ساتھ مندر میں کیسے گھس گئے۔ یہ ہماری ہندستان کے پولس انتظامیہ کے لئے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی کہ ہمارے ہندستان کی پولس انتظامیہ کتنی مضبوط ہے۔

خیر جو ہوا وہ بہت ہی برا ہوا ہے اور بہت ہی شرمناک حرکت ہے اس کے لئے ہمیں تیار ہونا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا اور اتحاد بنا کر رکھنا ہوگا۔

کچھ یادیں

ساجیہ نکہت

تمہارا چہرا میرے آنکھوں میں اب بھی بسا ہے
تمہاری ہنسی میرے گالوں میں اب بھی کھلی ہے
تم چلے گئے کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لئے
میرا انتظار میرے آنکھوں میں آنسو بنا اب بھی رکا ہے

لوٹ کے واپس آنا تمہارے بس میں نہیں
اپنے دل سے تمہیں مٹانا میرے بس میں نہیں
تمہیں آواز دیتی ہوں تنہائی میں ہمیشہ
تمہارے جگہ کسی اور کو بسانا میرے بس میں نہیں

تمہیں یاد کر کے کبھی روتی ہوں
بجھتے ہوئے شمع کو پھر سے جلا دیتی ہوں
کاش تم ان لہروں کے جیسے ہوتے
جو جانے کے بعد پھر لوٹ آتے ہیں

خاموشیوں کے ساتھ ہمارا دن نکلتا ہے
کلفتوں کو بہاتے ہماری رات گذرتی ہے
تمہاری بے جان تصویر دبی مدہوش
ہمارے جسم سے ہماری جان نکلتی ہے

زندگی کے لمبے سفر میں ساتھ نکلتے تھے ہم
چھوڑ گئے تنہا مجھے اس سفر میں
نہ راستے کو پتہ نہ منزل کا مجھے
تمہارے بنا چلنا نہ گوارہ ہے مجھے

دل کے کسی کونے میں آج بھی سانس لیتے ہو تم
نہ ہونے کے بعد بھی ہونے کا احساس دیتے ہو تم
ایک دن واپس آجاؤ گے
یہ وعدہ اس دن کر کے گئے ہو تم

نمی آنکھوں کی نہ جانے کہاں کھو گئی
ہونٹوں کی ہنسی بے جان کی ہو گئی
تمہارے نہ ہونے پر بھی ہونے کا احساس
مجھے جینے کا سہارا دے دے

غزلیں

محمد وسیم خان

کلاس بی۔اے فرسٹ (پاس کورس)، رول نمبر ۲۰۰-۳۰۷

وہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے
کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے

یہ جو تشنہ لب اٹھے ہیں تیری انجمن سے ساقی
کہیں زہر پی نہ جائیں تیری بے رخی کے پیچھے

تجھے غیر کی تمنا، مجھے تیری آرزو ہے
میں تو بن گیا تماشا تیری دل لگی کے پیچھے

چلا جب میرا جنازہ لبِ بام سے وہ بولے
یہ برات کس کی نکلی میری زندگی کے پیچھے

○

ایک نظر دیکھ لوں آپ کو دل کو یہ حوصلہ دیجئے
بڑھتی جاتی ہے بے تابیاں رخ سے پردہ ہٹا دیجئے

جب محبت نہیں ہے تو کیوں میری تحریر ہے ہاتھ میں
آپ مجھ سے خفا ہیں تو میرے خط بھی جلا دیجئے

آپ سے ہے بچھڑنے کا غم اپنے دل سے ہیں مجبور ہم
اب یہ دوری نہ سہ پائیں گے دوریاں اب مٹا دیجئے

پہلے ہی جل چکی ہیں بہت بستیاں آپ کے شہر میں
بجھ چکے ہیں جو شعلے اسے آپ پھر مت ہوا دیجئے

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY
ESTD-1916

নরহত্যার নতুন নক্সা পেশ করল গুজরাট ...

মানুষ মেরেছি আমি — তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি

নন্দ দাশ